প্রথম প্রকাশ ১৯৬০

প্রকাশক :

অভীক রায়

১১৭, কেশব সেন স্ট্রীট.

কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক :

সিদ্ধেশ্বরী প্রিন্টিং ওয়ার্কস

২। জি, অবিনাশ ঘোষ লেন

কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র

ফুলিয়া

আমি যখন বাড়িতে পৌঁছলুম তখন দুপুর,
চতুর্দিকে চিক্‌চিক করছে রোদ্দুর—;
আমার শরীরের ছায়া ঘুরতে ঘুরতে ছায়াহীন
একটি রেখায় এসে দাঁড়িয়েছে।

কেউ চিনতে পারেনি আমাকে,
ট্রেনে সিগারেট জ্বালাতে গিয়ে একজনের কাছ থেকে
আগুন চেয়ে নিয়েছিলুম, একজন মহকুমা স্টেশনে উঠেই
আমাকে জাপটে ধরতে চেয়েছিল, একজন পেছন থেকে
কাঁধে হাত রেখে চিৎকার করে উঠেছিল; -আমি সবাইকে
মানুষের সমিল চেহারার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছি।
কেউ চিনতে পারেনি আমাকে, একজন রাজনৈতিক নেতা
তিনি কমিউনিষ্ট ছিলেন, মুখোমুখি বসে দূর থেকে
বারবার চেয়ে দেখলেন—, কিন্তু চিনতে পারলেন না।

বারহাট্টায় নেমেই রফিজের স্টলে চা খেয়েছি,
অথচ কী আশ্চর্য, পুনর্বার চিনি দিতে এসেও
রফিজ আমাকে চিনলো না।
দীর্ঘ পাঁচ বছর পর পরিবর্তনহীন গ্রামে ফিরছি আমি।
সে একই ভাঙাপথ, একই কালোমাটির আল ধরে
গ্রামে ফেরা, আমি কতদিন পর গ্রামে ফিরছি।

আমি যখন গ্রামে পৌঁছলুম তখন দুপুর,
আমার চতুর্দিকে চিক্‌চিক করছে রোদ,
শোঁ-শোঁ করছে হাওয়া।
অনেক বদলে গেছে বাড়িটি,
টিনের চাল থেকে শুরু করে গরুর গোয়াল;
চিহ্নমাত্র শৈশবের স্মৃতি যেন নেই কোনোখানে।

পড়ার ঘরের বারান্দায় নুয়ে-পড়া বেলিফুলের গাছ থেকে
একটি লাউডুগী উত্তপ্ত দুপুরকে তার লক্‌লকে জিভ দেখালো।
স্বতঃস্ফূর্ত মুখের দাড়ির মতো বাড়িটির চতুর্দিকে ঘাস, জঙ্গল,
গর্ত, আগাছার গাঢ় বন গড়ে উঠেছে অনায়াসে ; যেন সবখানেই

সভ্যতাকে ব্যঙ্গ করে এখানে শাসন করছে গোঁয়ার প্রকৃতি।
একটি শেয়াল একটি কুকুরের পাশে শুয়েছিল প্রায়,
আমাকে দেখেই পালালো একজন, একজন গন্ধ শুঁকে নিয়ে
আমাকে চিনতে চেষ্টা করলো — যেমন পুলিশ-সমেত চেকার
তেজগাঁয় আমাকে চিনতে চেষ্টা করেছিল।
হাঁটতে-হাঁটতে একটি গাছ দেখে থমকে দাঁড়ালাম,
অশোক গাছ, বাষট্টির ঝড়ে ভেঙে-যাওয়া অশোক,
একসময় কী ভীষণ ছায়া দিতো এই গাছটা :
অনায়াসে দু'জন মানুষ মিশে থাকতে পারতো এর ছায়ায় ।
আমরা ভালোবাসার নামে একদিন সারারাত
এ-গাছের ছায়ার লুকিয়েছিলুম ।
সেই বাসন্তী, আহা সেই বাসন্তী এখন বিহারে,
ডাকাত স্বামীর ঘরে চার-সন্তানের জননী হয়েছে ।

পুকুরের জলে শব্দ উঠলো মাছের, আবার জিভ দেখালো সাপ,
শান্ত-স্থির বোকা গ্রামকে কাঁপিয়ে দিয়ে
একটি এরোপ্লেন তখন উড়ে গেলো পশ্চিমে ...।
আমি বাড়ির পেছন থেকে শব্দ করে দরোজায় টোকা দিয়ে
ডাকলুম, - 'মা'।
বহুদিন যে-দরোজা খোলেনি,
বহুদিন যে-দরোজায় কোনো কণ্ঠস্বর ছিল না,
মরচে-পরা সেই দরোজা মুহূর্তেই ক্যাচ্‌ক্যাচ শব্দ করে খুলে গেলো ।
বহুদিন চেষ্টা করেও যে গোয়েন্দা-বিভাগ আমাকে ধরতে পারেনি,
চৈত্রের উত্তপ্ত দুপুরে, অফুরন্ত হাওয়ার ভিতরে সেই আমি
কত সহজেই একটি আলিঙ্গনের কাছে বন্দী হয়ে গেলুম ;
সেই আমি কত সহজেই মায়ের চোখে চোখ রেখে
একটি অবুঝ সন্তান হয়ে গেলুম ।

মা আমাকে ক্রন্দনসিক্ত একটি চুম্বনের মধ্যে
লুকিয়ে রেখে অনেক জঙ্গলের পথ অতিক্রম করে
পুকুরের জলে চাল ধুতে গেলেন ; আমি ঘরের ভিতরে তাকালুম,
দেখলুম দু'ঘরের মাঝামাঝি যেখানে সিদ্ধিদাতা গণেশের ছবি ছিল,
সেখানে লেনিন, বাবার জমা-খরচের পাশে কার্ল মার্কস ;
আলমিরার একটি ভাঙা-কাচের অভাব পূরণ করছে
ক্রুপস্কায়ার ছেঁড়া ছবি ।

মা পুকুর থেকে ফিরছেন, সন্ধ্যায় মহকুমা শহর থেকে
ফিরবেন বাবা, তাঁর পিঠে সংসারের ব্যাগ ঝুলবে তেমনি ।
সেনবাড়ি থেকে খবর পেয়ে বৌদি আসবেন,
পুনর্বার বিয়ে করতে অনুরোধ করবেন আমাকে ।
খবর পেয়ে যশমাধব থেকে আসবে ন্যাপকর্মী ইয়াসিন,
তিন মাইল বিষ্টির পথ হেঁটে রসুলপুর থেকে আসবে আদিত্য ।
রাত্রে মারাত্মক অস্ত্র হাতে নিয়ে আমতলা থেকে আসবে আব্বাস ।
ওরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞেস করবে ঢাকার খবর :

— আমাদের ভবিষ্যৎ কী ?
— আইয়ুব খান এখন কোথায় ?
— শেখ মুজিব কি ভুল করছেন ?
— আমার নামে কতদিন আর এরকম হুলিয়া ঝুলবে ?

আমি কিছুই বলবো না ।
আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকা সারি সারি চোখের ভিতরে
বাংলার বিভিন্ন ভবিষ্যৎকে চেয়ে চেয়ে দেখবো।
উৎকণ্ঠিত চোখে চোখে নামবে কালো অন্ধকার, আমি চিৎকার করে
কণ্ঠ থেকে অক্ষম বাসনার জ্বালা মুছে নিয়ে বলবো :
'আমি এ সবের কিছুই জানি না,
আমি এ সবের কিছুই বুঝি না।'

অসমাপ্ত কবিতা

মাননীয় সভাপতি .....। সভাপতি কে ? কে সভাপতি ?
ক্ষমা করবেন সভাপতি সাহেব,
আপনাকে আমি সভাপতি মানি না ।
তবে কি রবীন্দ্রনাথ ? সুভাষচন্দ্র বসু? হিটলার ?
মাও সে তুং ? না, কেউ না, আমি কাউকে মানি না,
আমি নিজে সভাপতি এই মহতী সভার ।
মাউথপিস আমার হাতে এখন, আমি যা বলবো
আপনারা তাই শুনবেন ।

উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আমার সংগ্রামী শ্রোতারা,
(একজন অবশ্য আমার প্রেমিকা এখানে আছেন)
আমি আজ আপনাদের কাছে কিছু বলতে চাই ।
আপনারা জানেন, আমি কবি,
রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপীয়ার, এলিয়টের মতোই
আমিও কবিতা লিখি এবং মূলত কবি ।
কবিতা আমার নেশা, পেশা ও প্রতিশোধ গ্রহণের
হিরন্ময় হাতিয়ার । আমি কবি, কবি এবং কবিই ।

কিন্তু আমি আর কবিতা লিখবো না ।
পল্টনের ভরা সমাবেশে আমি ঘোষণা করছি,
আমি আর কবিতা লিখবো না ।
তবে কি রাজনীতি করবো ? কন্ট্রাক্টারী ?
পুস্তক ব্যবসায়ী ও প্রকাশক?
পত্রিকার সাব-এডিটর ?
নীলক্ষেতে কলাভবনের খাতায় হাজিরা ?
বেশ্যার দালাল?
ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে তেল-নুন-ডালের দোকান ?
রাজমিস্ত্রি ? মোটর ড্রাইভিং ? স্মাগলিং ?
আণ্ডারডেভেলপমেন্ট স্কুলে শিক্ষকতা ?
নাকি সবাইকে ব্যঙ্গ করে, বিনয়ের সব চিহ্ন-সূত্র
ছিঁড়ে-খুঁড়ে প্রতিষ্ঠিত বুড়ো, বদ-কবিদের
চোখে-নাকে-মুখে কিংস্টর্কের কড়া ধোঁয়া ছুঁড়ে দেব ?
-অর্থাৎ অপমান করবো বৃদ্ধদের ?

আপনারা কেউ বেশ্যাপাড়ায় ভুলেও যাবেন না,
এরকম প্রতিশ্রুতি দিলে বেশ্যার দালাল হতে পারি,
রসোন্মত্ত যৌবন অবধি—, একা - একা।
আমার বক্তব্য স্পষ্ট, আমার বিপক্ষে গেলেই
তথাকথিত রাজনীতিবিদ, গাড়ল বুদ্ধিজীবী,
অশিক্ষিত বিজ্ঞানী, দশতলা বাড়িওয়ালা ধনী-ব্যবসায়ী,
সাহিত্য-পত্রিকার জঘন্য সম্পাদক, অতিরিক্ত জনসমাবেশ
আমি ফুঁ দিয়ে তুলোর মতন উড়িয়ে দেবো ।

আপনারা আমার সঙ্গে নদী যেমন জলের সঙ্গে
সহযোগিতা করে, তেমনি সহযোগিতা করবেন,
অন্যথায় আমি আমার ঘিয়া পাঞ্জাবির গভীর পকেটে
আমার প্রেমিকা এবং 'আ মরি বাঙালা ভাষা' ছাড়া
অনায়াসে পল্টনের ভরাট ময়দান তুলে নেবো ।
ভাইসব, চেয়ে দেখুন, বাঙলার ভাগ্যাকাশে
আজ দুর্যোগের ঘনঘটা,সুনন্দার চোখে জল,
একজন প্রেমিকার খোঁজে আবুল হাসান
কী নিঃসঙ্গ ব্যথায় কাঁপে রাত্রে, ভাঙে সূর্য,
ইপিআরটিসি'র বাস, লেখক সংঘের জানালা,
প্রেস ট্রাস্টের সিঁড়ি, রাজিয়ার বাল্যকালীন প্রেম।
আপনারা কিছুই বোঝেন না, শুধু বিকেল তিনটে এলেই
পল্টনের মাঠে জমায়েত, হাততালি, জিন্দাবাদ,
রক্ত চাই ধ্বনি দিয়ে একুশের জঘন্য সংকলন,
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার কিনে নেন ।
আমি শেষবারের মতো বলছি
আপনারা যার -যার ঘরে, পরণে ঢাকাই শাড়ি
কপালে-সিঁদুরে ফিরে যান। আমি এখন অপ্রকৃতিস্থ
পূর্ব-বাঙলার অন্যতম ভীষণ মাতাল বক্তা একজন,
ফুঁ দিয়ে নেভাবো আগুন, উন্মাদ শহর,
আপনাদের অশ্লীল-গ্রাম্য-অসভ্য সমাবেশে,
লালুসালু ঘেরা স্টেজ, মাউথ অর্গান, ডিআইটি,
গোল স্টেডিয়াম, এমসিসি'র খেলা,
ফল অফ দি রোমান এ্যাম্পায়ারের নগ্ন পোস্টার।
এখন আমার হাতে কার্যরত নীল মাইক্রোফোন
উত্তেজিত এবং উন্মাদ ।

শ্রদ্ধেয় সমাবেশ, আমি আমার সাংকেতিক
ভয়াবহ সান্ধ্য আইনের সাইরেন বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে
মাধবীর সারা মাঠ খালি করে দেবেন ।
আমি বড় ইনসিকিওরড, যুবতী মাধবী নিয়ে
ফাঁকা পথে ফিরে যেতে চাই ঘরে,
ব্যক্তিগত গ্রামে, কাশবনে ।

আমি আপনাদের নির্বাচিত নেতা।
আমীর সঙ্গে অনেক টাকা, জিন্নাহর কোটি কোটি
মাথা; আমি গণভোটে নির্বাচিত বিনয় বিশ্বাস,
রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্ণর, অথচ আমার কোনো
সিকিউরিটি নেই, একজন বডিগার্ড নেই,

সশস্ত্র হামলায় যদি টাকা কেড়ে নেয় কেউ
— আমি কী করে হিসেব দেবো জনতাকে?
স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি হলে কন্যার কাঁকন যাবে খোয়া,
আপনার আমার সকলের ক্ষতি হবে,
সোনার হাতে সোনার কাঁকন আর উঠবে না।
আপনারা ভাবেন, আমি খুব সুখে আছি,
কিন্তু বিশ্বেস করুন, হে পল্টন,
মাঘী পূর্ণিমার রাত থেকে ফাল্গুনের পয়লা অবধি
কী ভীষণ দুর্বিষহ আগুন জ্বলছে আমার দুখের দাড়িতে,
উষ্কুখুষ্কু চুলে, মেরুদণ্ডের হাড়ে, নয়টি আঙুলে,
কোমরে, তালুতে, পাজামার গিঁটে, চোখের সকেটে।

দেখেছি তো কাম্যবস্তু স্বাধীনতা, প্রেমিক ও গণভোট
হাতে পেয়ে গেলে নির্জন হীরার আগুনে
পুলিশের জীপ আর টায়ারের মতো পুড়ে-পুড়ে যাই,
অমর্যাদা করি তাকে যাকে চেয়ে ভেঙেছি প্রাসাদ,
নদী, রাজমিস্ত্রি এবং গোলাপ।

আমি স্বাধীনতা পেয়ে গেলে পরাধীন হতে ভালোবাসি।

প্রেম এসে যাযাবর কণ্ঠে চুমু খেলে মনে হয় বিরহের
স্মৃতিচারণের মতো সুখ কিছু নেই।
বাক্-স্বাধীনতা পেলে আমি শুধু প্রেম, রমণী, যৌনতা
ও জীবনের অশ্লীলতার কথা বলি।
আমি কিছুতেই বুঝি না, আপনারা তবু কোন্ বিশ্বাসে
বাঙলার মানুষের ভবিষ্যৎ আমার স্কন্ধে চাপিয়ে দিলেন।
আপনারা কী চান?
ডাল-ভাত-নুন?

ঘর-জমি-বউ ?

রূপ-রস-ফুল ?

স্বাধীনতা ?

রেফ্রিজারেটর ?

ব্যাংক-বীমা-জুয়া ?

স্বায়ত্তশাসন ?

সমাজতন্ত্র ?

আমি কিছুই পারি না দিতে, আমি শুধু কবিতার
অনেক স্তবক, অবাস্তব অন্ন বস্ত্র বীমাহীন জীবনের
ফুল এনে দিতে পারি সুস্থ সকলের হাতে ।
আমি স্বাভাবিক সুস্থ সৌভাগ্যের মুখে থুথু দিয়ে
অস্বাভাবিক অসুস্থ শ্রীমতী জীবন বুকে নিয়ে
কী করে কাটাতে হয় অরণ্যের ঝড়ের রাত্রিকে
তার শিক্ষা দিতে পারি । আমি রিজার্ভ ব্যাংকের
সবগুলো টাকা আপনাদের দিয়ে দিতে পারি,
কিন্তু আপনারাই বলুন— অর্থ কি বিনিময়ের মাধ্যম ?
জীবন কিংবা মৃত্যুর ? প্রেম কিংবা যৌবনের ?
অসম্ভব, অর্থ শুধু অনর্থের বিনিময় দিতে পারে ।

স্মরণকালের বৃহত্তম সভায় আজ আমি
সদর্পে ঘোষণা করছি, হে বোকা জমায়েত,
পল্টনের মাঠে আর কোনোদিন সভাই হবে না,
আজকেই শেষ সভা, শেষ সমাবেশে শেষ বক্তা আমি ।
এখনো বিনয় করে বলছি, সাইরেন বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে
আপনারা এই মাঠ খালি করে দেবেন।
এই পল্টনের মাঠে আমার প্রেমিকা ছাড়া
আর যেন কাউকে দেখি না! কোনোদিন ।
এই সারা মাঠে আমি একা, একজন আমার প্রেমিকা ।

উন্নত হাত

আগুন লেগেছে রক্তে মাটির গ্লোবে,
যুবক গ্রীষ্মে ফাল্গুন পলাতক।
পলিমাখা চাঁদ মিছিলে চন্দ্রহার
উদ্ধত পথে উন্নত হাত ডাকে,
সূর্য ভেঙেছে অশ্লীল কারাগার ।

প্রতীক সূর্যে ব্যাকুল অগ্নি জ্বলে,
সাম্যবাদের গর্বিত কোলাহলে
আগুন লেগেছে রক্তে মাটির গ্লোবে।

রক্তক্ষরণে সলিল সমাধি কার ?
মানুষের মুখে গোলাপের স্বরলিপি
মৃত্যু এনেছে নির্মম দেবতার।

পুরোভাগে হাঁটে মুক্ত-ভূমণ্ডল......
আগুন লেগেছে রক্তে মাটির গ্লোবে ।

মানুষের হাতে হত্যার অধিকার ?
পুষ্পের নিচে নিহত শিশুর শব,
গোরস্থানেও ফসফরাসের আলো
অর্জুন সবে স্বপ্নের সম্ভবে,
আগুন লেগেছে রক্তে মাটির গ্লোবে।

মানুষ

আমি হয়তো মানুষ নই, মানুষগুলো অন্যরকম,
হাঁটতে পারে, বসতে পারে, এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যায়
মানুষগুলো অন্যরকম, সাপে কাটলে দৌড়ে পালায় ।

আমি হয়তো মানুষ নই, সারাটা দিন দাঁড়িয়ে থাকি,
গাছের মতো দাঁড়িয়ে থাকি ।
সাপে কাটলে টের পাই না, সিনেমা দেখে গান গাই না,

অনেকদিন বরফমাখা জল খাই না।
কী করে তাও বেঁচে থাকছি, ছবি আঁকছি, সকালবেলা,
দুপুরবেলা অবাক করে সারাটা দিন বেঁচেই আছি
আমার মতো। অবাক লাগে।

আমি হয়তো মানুষ নই, মানুষ হলে জুতো থাকতো,
বাড়ি থাকতো, ঘর থাকতো,
রাত্রিবেলায় ঘরের মধ্যে নারী থাকতো,
পেটের পটে আমার কালো শিশু আঁকতো।

আমি হয়তো মানুষ নই,
মানুষ হলে আকাশ দেখে হাসবো কেন ?
মানুষগুলো অন্যরকম, হাত থাকবে, নাক থাকবে,
তোমার মতো চোখ থাকবে।
ভালোবাসার কথা দিলেই কথা রাখবে।

মানুষ হলে উরুর মধ্যে দাগ থাকতো,
চোখের মধ্যে অভিমানের রাগ থাকতো,
বাবা থাকতো, বোন থাকতো,
ভালবাসার লোক থাকতো,
হঠাৎ করে মরে যাবার ভয় থাকতো
আমি হয়তো মানুষ নই,
মানুষ হলে তোমাকে ছাড়া সারাটা রাত
বেঁচে-থাকাটা আর হতো না।
মানুষগুলো সাপে কাটলে দৌড় পালায়;
অথচ আমি সাপ দেখলে এগিয়ে যাই,
অবহেলায় মানুষ ভেবে জাপটে ধরি।

লজ্জা

আমি জানি, সে তার প্রতিকৃতি কোনোদিন ফটোতে দেখেনি,
আয়নায়, অথবা সন্দ্বীপে বসে যেরকম
সর্বনাশা সমুদ্র দেখা যায়, তার জলে
মুখ দেখে হঠাৎ লজ্জায় সে শুধুই ম্লান হতো একদিন ।

আমি জানি পিঠ থেকে সুতোর কাপড়
কোনোদিন খোলেনি সে পুকুরের জলে, লজ্জা,
সমস্ত কিছুতে লজ্জা; কণ্ঠে, চুলের খোঁপায়, চোখের তারায়।
আমি জানি আসন্নপ্রসব-অপরাধে, অপরাধবোধে
স্ফীতোদর সেই নারী কী রকম লজ্জাশীলা ছিল।

অথচ কেমন আজ ভিনদেশী মানুষের চোখের সমুখে
নগ্ন সে, নির্লজ্জ, নিশ্চুপ হয়ে শুয়ে আছে
জলাধারে পশু আর পুরুষের পাশে শুয়ে আছে
তার ছড়ানো মাংসল বাহু নগ্ন,
কোমর, পায়ের পাতা, বুকের উত্থানগুলো নগ্ন,
গ্রীবার লাজুক ভাঁজ নগ্ন ; - কে যেন উন্মাদ হয়ে
তার সে নিঃশব্দ নগ্নতায় বসে আছে ।
তার সমস্ত শরীরে জুড়ে প্রকৃতির নগ্ন পরিহাস,
শুধু গোপন অঙ্গের লজ্জা ঢেকে আছে
সদ্য-প্রসূত-মৃত সন্তানের লাশ ।

তার প্রতিবাদহীন স্বাধীন নগ্নতা বন্দী করে এখন
সাংবাদিক, ঝুলন্ত ক্যামেরা নিয়ে ফটোগ্রাফার
ফিরে যাচ্ছে পত্রিকার বিভিন্ন পাতায় । অসহায়,
সূর্যের কাফনে মোড়ানো আমার বোনের মতো এই লাশ
আগের মতন আর বলছে না, বলবে না :
'আমি কিছুতেই ছবি তুলবো না ....।'
যেন তার সমস্ত লজ্জার ভার এখন আমার । কেবল আমার ।

যুদ্ধ

যুদ্ধ মানেই শত্রু শত্রু খেলা,
যুদ্ধ মানেই
আমার প্রতি তোমার অবহেলা ।

আগ্নেয়াস্ত্র

পুলিশ স্টেশনে ভিড়, আগ্নেয়াস্ত্র জমা নিচ্ছে শহরের
সন্দিগ্ধ সৈনিক। ।সামরিক নির্দেশে ভীত মানুষের
শটগান, রাইফেল, পিস্তল এবং কার্তুজ, যেন দরগার
স্বীকৃত মানৎ ; টেবিলে ফুলের মতো মস্তানের হাত।

আমি শুধু সামরিক আদেশে অমান্য করে হয়ে গেছি
কোমল বিদ্রোহী, প্রকাশ্যে ফিরছি ঘরে,
অথচ আমার সঙ্গে হৃদয়ের মতো মারাত্মক
একটি আগেয়াস্ত্র, আমি জমা দিই নি ।

রবীন্দ্রনাথের বাঁশি

যারা গান গাইতো বাঁশিতে আঙুল রেখে,
যারা কবিতা লিখতো মধ্যরাতে, সেইসব চাষী,
সেইসব কারখানার শ্রমিক, যারা ইস্পাতের
আসল নির্মাতা, যারা তৈরী করতো স্নো-বিস্কিট,
আমার জন্য শার্ট, নীলিমার জন্য শাড়ি, তারা এখন
অন্য মানুষ, তাদের বাড়ি এখন প্রতিরোধের দুর্গ ।

যারা গান গাইতো বাঁশিতে আঙুল রেখে,
যারা ছাত্র ছিল পাঠশালায়, বিশ্বের, সভ্যতার
কিংবা প্রকৃতির, সেইসব ছাত্র -শিক্ষক -শ্রমিক
একত্রে মিলিত হয়ে ওরা এখন অন্যরকম ;
ওরা এখন গান গায় না, ওরা এখন অন্য মানুষ।
কাঠের লাঙল যারা চেপে রাখতো মাটির ওরসে,
সেইসব শিল্পী, সেইসব শ্রমিক,

যারা গান গাইতো বাঁশিতে আঙুল রেখে,
যারা স্বপ্ন দেখতো রাতে—; ধলেশ্বরী নদী-তীরে
পিসীদের গ্রাম থেকে ওরা এখন শহরে আসছে।

কাঠের লাঙল ফেলে লোহার অস্ত্র নিয়েছে হাতে,
কপালে বেঁধেছে লালসালুর আকাশ,
শহর জয়ের উল্লাসে ওরা রবীন্দ্রনাথকে বলছে
স্বাধীনতা, রবীন্দ্রনাথের গানকে বলছে স্টেনগান।
যারা কবিতা লিখতো রাতে, সেইসব চাষী
আজ যুদ্ধের অভিজ্ঞ-কৃষক
তোমার জন্য বন্দুকের নল আজ আমারো হাতের বাঁশি।

ফুলদানি

যেকোনো বাগান থেকে যেটা ইচ্ছে সেই ফুল,
যেকোনো সময় আমি তুলে নিয়ে যদি কভু
তোমার খোঁপায়, আহা, অজগর তোমার খোঁপায়
সাজাবার সুযোগ পেতাম—; তাহলে দেখতে লীলা,
তোমার শরীর ছুঁয়ে লাবণ্যের লোভন ফুলেরা
উ[illegible]ত্ত হতো, মত্ত মমতায়
বলতো আশ্চ[illegible] হয়ে,হতো বলতেই:
'খোঁপার মতন কোনো ফুলদানি নেই।'

প্রথম অতিথি

এরকম বাংলাদেশ কখনো দেখো নি তুমি।
মুহূর্তে সবুজ ঘাস পুড়ে যায়,
ত্রাসের আগুন লেগে লাল হয়ে জ্বলে ওঠে চাঁদ।
নরোম নদীর চর হা-করা কবর হয়ে
গ্রাস করে পরম শত্রুকে ;
মিত্রকে জয়ের চিহ্ন, পদতলে প্রেমে,
ললাটে ধুলোর টিপ এঁকে দেয় মায়ের মতন;

এরকম বাংলাদেশ কখনো দেখো নি তুমি।

নদীর জলের সঙ্গে মানুষের রক্ত মিশে আছে,
হিজল গাছের ছায়া বিপ্লবের সমান বয়সী।
রূপসী নারীর চুল ফুল নয়,গুচ্ছ গুচ্ছ শোকের প্রতীক,
বাংলাদেশ আজ যেন বাংলাদেশ নয়;
এরকম বাংলাদেশ কখনো দেখো নি তুমি।
কখনো দেখে নি কেউ।

বাতাস বাতাস শুধু নয়,
ত্রিশ লক্ষ মানুষের দীর্ঘশ্বাসময়
আকাশ আকাশ শুধু নয়,
এরকম বাংলাদেশ বাংলাদেশ নয়।
এখানে প্রাণের মূল্যে
নদীর জলের মধ্যে আসে বান,
টর্নেডো-টাইফুন-ঝড়,
কাল-বৈশাখীর দুরন্ত তুফান।

কোকিল কোকিল শুধু নয়,
পাখি শুধু পাখি নয় গাছে,
বাউলের একতারা উরুর অস্থির মতো
যেন আগ্নেয়াস্ত্রে বারুদের মজ্জা মিশে আছে।

আজকাল গান শুধু গান নয়, সব গান অভিমান,
প্রাণের চিৎকার বলে ক্রুদ্ধ মনে হয়।
এরকম বাংলাদেশ কখনো দেখে নি কেউ,
তুমি তার প্রথম অতিথি।

সল্টলেকের ইন্দিরা

শত্রুর তাড়া খেয়ে আমরা যাবো না আর
সীমান্তের দেয়াল ডিঙিয়ে কোনোদিন।
ছিন্নমূল, পাখির মতন নিঃস্ব
মানুষের ঝাঁক, সল্টলেকে, কল্যাণীতে,
মেঘালয়ে, ত্রিপুরার প্রত্যন্ত প্রদেশে
আর কোনোদিন উন্মুখর তোমার প্রতীক্ষায়

আমাদের সময় যাবে না অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ
চোখের সমুখে।

সমস্যাসংকুল এই শতাব্দীর
এক কোটি মানুষের ভিড়ে
ফিরে ফিরে তুমিও যাবে না আর
কোনোদিন ক্ষমাপ্রার্থী মানবতা হতে ।
নিজ হাতে আকাশের তারার আলোকে
বেঁধে দিয়ে ঘর, ভালোবাসা, চাল-ডাল,
উদ্যম প্রহর নিয়ে তুমি আর ফিরবে না
মুক্তিবাহিনীর শিবিরে শিবিরে।

এখন শূন্য সব, তিনশ' দিনের ঘর,
হা-করা দুয়ার, মেঘালয়,
সল্টলেক, কল্যাণীর সশস্ত্র-শিবির,
কিংবা আগরতলার খোলা মাঠ ।
কে যেন স্বপ্নের মতো চুপি চুপি এসে
শূন্য কপাট দিয়ে ঢেকে রেখে গেছে সবকিছু।

একদিন নিজ হাতে বেঁধে দিয়েছিলে ঘর,
মনোহর ভালোবাসা, স্বাধীনতা দিয়ে।
এখন শান্ত সব, সল্টলেক একাকী ঘুমিয়ে আছে
যেন পরিত্যক্ত দেশপ্রেমিকের খালি বাড়ি;
রাজাকার, আল্‌-বদরের ভয়ে ভীত,
মৃত, ম্রিয়মাণ।

তোমার নোয়ানো মাথা সল্টলেকে,
শরণার্থীর ঘরে ঘরে বৃষ্টির অন্ধকারে
অক্ষয় আগুন হয়ে একদিন জ্বলে উঠেছিল।
আজ সে উদ্ধত মাথা বরাভয়ে
সবচেয়ে বড় সেই আকাশের
দর্পকেই স্পর্শ করেছে।

সল্টলেকের ভাঙা-ঘর, মাদুর, চাঁদের কাঁথা,

ভালোবাসা, স্মৃতি; এখন বিস্তৃত হয়ে
ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। সীমান্তের চিহ্ন ভেঙে
ঢুকে গেছে পৃথিবীর অসীম হাওয়ায়......।

বিশ্বাসের আগুন

অন্ধকারে ভয় করি না, যারা নক্ষত্রের
শাড়িতে আগুন জ্বেলে ঘরে ফিরছে—
তারাই দেখাবে পথ।
পাথরে পাথর ঘষে যদি আগুন না জ্বলে,
আমার আঁধারে আঁধার ঘষে
ব্যতিক্রম আগুন জ্বালাবো।

একটি পাথর তুলে আঁধারের আরেকটি
পাথরে ছুঁড়ে মারবো প্রেম।
ভালোবাসা আলো জ্বালবে।
জ্বিরের জ্বালার মতো জ্বলজ্বলে
আকাশের আগুন ।অন্ধকারে ভয় করি না,
আমরা আঁধারের গাল ছুঁয়ে
নেমে আসবো দল বেঁধে।

সংরক্ত বিশ্বাস এসে ডেকে নেবে
হারানো স্বপ্নের কাছাকাছি।
মাটির প্রদীপ জ্বেলে, মা আমার,
আমি আসিয়াছি, অন্ধকারে,
মধ্যরাতে নক্ষত্রের লাল-পাড়ে ।
বিশ্বাসের আগুন জ্বালিয়ে।

তোমার হাতের শাঁখা জ্বলে উঠবে
স্নেহে, তোমার ছেলে ঘরে ফিরবে,
জায়নামাজের মধ্যে তার স্পষ্ট
পদচিহ্ন, মোমের শিখার টানে
অন্তর্গত সুতোর মতন তোমার প্রার্থনা
উদ্ভাসিত হবে ক্রমে ক্রমে।

তোমার হাতের তসবিহ্‌র মতো
মৃত লক্ষ-ছেলের মাথার খুলি

আজ কী সুন্দর আলো দিচ্ছে দেখো।
মাগো, অন্ধকারে ভয় করো না,
আমরা ফুসফুসে আগুন জেলে
তোমার জন্য ঘরে ফিরছি;
পাথরে পাথর ঘষে
পাথরে হৃদয় ঘষে
হৃদয়ে হৃদয়।

স্বাধীনতা, উলঙ্গ কিশোর

জননীর নাভিমূল ছিঁড়ে উলঙ্গ শিশুর মতো
বেরিয়ে এসেছো পথে, স্বাধীনতা, তুমি দীর্ঘজীবী হও।

তোমার পরমায়ু বৃদ্ধি পাক আমার অস্তিত্বে, স্বপ্নে,
প্রাত্যাহিক বাহুর পেশীতে, জীবনের রাজপথে,
মিছিলে মিছিলে, তুমি বেঁচে থাকো, তুমি দীর্ঘজীবী হও।

তোমার হা-করা মুখে প্রতিদিন সূর্যোদয় থেকে
সূর্যাস্ত অবধি হরতাল ছিল একদিন,
ছিল ধর্মঘট, ছিল কারখানার ধুলো।
তুমি বেঁচেছিলে মানুষের কলকোলাহলে,
জননীর নাভিমূলে ক্ষতচিহ্ন রেখে
যে তুমি উলঙ্গ শিশু রাজপথে বেরিয়ে এসেছো,
সে-ই তুমি আর কতদিন 'স্বাধীনতা, স্বাধীনতা' বলে
ঘুরবে উলঙ্গ হয়ে পথে পথে সম্রাটের মতো?

জননীর নাভিমূল থেকে ক্ষতচিহ্ন মুছে দিয়ে
উদ্ধত হাতের মুঠোয় নেচে ওঠা, বেঁচে থাকা
হে আমার দুঃখ, স্বাধীনতা, তুমিও পোশাক পরো;
ক্ষান্ত করো উলঙ্গ ভ্রমণ, নয়তো আমারো শরীর থেকে
ছিঁড়ে ফেলো স্বাধীনতা নামের পতাকা।

বলো উলঙ্গতা স্বাধীনতা নয়,
বলো দুঃখ কোনো স্বাধীনতা নয়,

বলো ক্ষুধা কোনো স্বাধীনতা নয়,
বলো ঘৃণা কোনো স্বাধীনতা নয়।

জননীর নাভিমূল ছিন্ন-করা রক্তজ কিশোর তুমি
স্বাধীনতা, তুমি দীর্ঘজীবী হও। তুমি বেঁচে থাকো
আমার অস্তিত্বে, স্বপ্নে, প্রেমে, বল পেন্সিলের
যথেচ্ছ অক্ষরে,
শব্দে,
যৌবনে,
কবিতায়।

ওটা কিছু নয়

এইবার হাত দাও, টের পাচ্ছো আমার অস্তিত্ব ? পাচ্ছো না?
একটু দাঁড়াও, আমি তৈরি হয়ে নিই।
এইবার হাত দাও, টের পাচ্ছো আমার অস্তিত্ব? পাচ্ছো না?
তোমার জন্মান্ধ চোখে শুধু ভুল অন্ধকার। ওটা নয়, ওটা চুল।
এই হলো আমার আঙুল, এইবার স্পর্শ করো, —না, না, না,
—ওটা নয়, ওটা কণ্ঠনালী, গরলবিশ্বাসী এক শিল্পীর
মাটির ভাস্কর্য, ওটা অগ্নি নয়, অই আমি,—আমার যৌবন।

সুখের সামান্য নিচে কেটে ফেলা যন্ত্রণার কবন্ধ-প্রেমিক,
ওখানে কী খোঁজ তুমি? ওটা কিছু নয়, ওটা দুঃখ;
রমণীর ভালোবাসা না-পাওয়ার চিহ্ন বুকে নিয়ে ওটা নদী,
নীল হয়ে জমে আছে ঘাসে,—এর ঠিক ডানপাশে, অইখানে
হাত দাও, হ্যাঁ, ওটা বুক, অইখানে হাত রাখো, ওটাই হৃদয়।

অইখানে থাকে প্রেম, থাকে স্মৃতি, থাকে সুখ, প্রেমের সিম্ফনি;
অই বুকে প্রেম ছিল, স্মৃতি ছিল, সব ছিল তুমিই থাকো নি।

ক্যামেলিয়া

বুকের উপরে তুমি খঞ্জর হাতে বসে আছো সীমারের মতো।
ক্যামেলিয়া, তুমিও কি ব্যর্থ-প্রেম? তুমিও কি প্রেমের সীমার?
তোমার উদ্ধত খঞ্জর আমার চৌচির বক্ষে কোন্ অপরাধে?
এ-বুকে কিছুই নেই, কিছু নেই, জীবনের ব্যর্থ-প্রেম ছাড়া।

তুমি ভুল করে বসেছো এখানে, তুমি ভুল হাতে তুলেছো খঞ্জর।
রসুলপ্রতিম তুমি আমাকে চুম্বন করো—, আমি লক্ষ লক্ষ প্রেমে
ব্যর্থ হয়ে, ব্যর্থ হতে হতে পৃথিবীর ব্যর্থতম প্রেমিকের মতো
ঈশ্বরের সম্মুখে গিয়েছি, ছুঁয়েছি নিজের মুখ, আত্ম-প্রতিকৃতি;
অপূর্ণ প্রেমের পাত্র পূর্ণ করিয়াছি। তুমি কী কী কেড়ে নিতে চাও?

এই নাও প্রিয়তমা, বুকের পাঁজর ঘেঁষে সমূলে বসিয়ে দাও
প্রেমের খঞ্জর, আমি একতিল নড়বো না। আমার সংরক্ত আত্মা
রক্তের প্লাবনে ভেসে নারীর ক্লেদের মতো অন্ধকারে বেরিয়ে আসুক,
আমি আলোর জোনাকী সেজে তোমার প্রেমের পাশে চিতা হয়ে রবো।
ক্যামেলিয়া, তুমিও কি ব্যর্থ-প্রেম? তুমিও কি প্রেমের সীমার?

তুমি

কী নাম তোমাকে দেবো, কোমলগান্ধার নাকি
বসন্তের অন্ধকারে পথহারা পাখি?
'কামনা তোমার নাম'—বলতেই লজ্জামাখা আঁখি
তুমি ঢেকেছো আঙুলে; তারপর প্রেম এসে
চুপিচুপি চুলে যেই বসেছে তোমার,
'বিদিশা-বিদিশা' বলে আমিও আবার কাছে আসিয়াছি।
তোমার দুরন্ত দেহে ছুঁয়েছি বকুল ।
সমুদ্রের ঝড়োরাতে অনায়াসে ভেসে-যাওয়া খড়কুটো,
পাপের আঙুল, তুমি ফিরালে না কেন?
তুমি কি কখনো চাও নাটোরের বনলতা হতে,.
অথবা আমার রক্তে পদ্ম হয়ে ভাসতে মৃণাল?
কাছে এসো প্রিয়তমা, কাছে এসো প্রিয়া,
—বলে যেই নগ্ন হাতে ডেকেছি তোমাকে;

তুমি কেন পরিপূর্ণ হৃদয় সঁপিয়া প্রেমের দুর্বল লোভে
ঝাঁপ দিতে গেলে যৌবনের অনির্বাণ অসীম চিতায় ?

কী নাম পছন্দ করো, পদ্মাবতী নাকি ক্লান্তি,
কী নাম তোমাকে দেবো ? বলো কোন্ নাম।
যদি বলি তুমি লজ্জা, লাজুক পাতার মতো প্রিয়,
ম্রিয়মাণ, তবে কেন লাজ ভেঙে শিশিরের সুস্পষ্ট ছোঁয়ায়
মধ্যরাতে জেগে ওঠো লজ্জাহীনা হয়ে ?

মাঝে মাঝে মনে হয় তুমিও ঘৃণার যোগ্য,
লাজহীন, অসুন্দর, ভীষণ কুৎসিত এক নারী।

লজ্জা নয়, আঁখি নয়, কোমলগান্ধার নয়,
বাসন্তী-বিদিশা নয়, ক্ষুধা কিংবা ঘৃণা বলে ডাকি।
মাটির মূর্তির মতো ভেঙ্গে ফেলি আঘাতে আঘাতে,
ঠোঁট থেকে ফিরাই চুম্বন, বাহুর বন্ধন থেকে ঠেলে দিই দূরে।
কে যেন ফেরায় তখন, প্রতিবাদ ওঠে অন্তঃপুরে।
আমি বুঝি, বড়ো লজ্জাহীন, কঠিন, নির্মম এই খেলা—
ভালোবাসা,—কী নাম তোমাকে দেবো ?
তুমি তো আমারই নাম, আমারই আঙুলে ছোঁয়া
আলিঙ্গনে বদ্ধ সারাবেলা।

ভয়

মাংসে চাকুর মতো যন্ত্রণায় গেঁথে আছো তুমি,
যেভাবে গোপনে চাঁদ অন্ধকারে থাকে গাঁথা
আকাশের গায়। কখনো রক্ত ঝরে, কখনো ক্ষতের
চিহ্নে বক্ষের পাঁজর বেয়ে ঝরে পড়ে পুঁজ, ভন্‌ভন্
শব্দে ওড়ে মাছি; তোমার স্মৃতির স্পর্শ বুকে নিয়ে
জেগে থাকি রোজ, — আজো জেগে আছি।

গলিত মাংসের মধ্যে আমের পোকার মতো
তুমি বসে কুরে কুরে খাও; তবু থাক্ মুগ্ধ প্রেম,
আমার বুকের মধ্যে আমূল প্রোথিত চাকু
আমি কোনোদিন খুলবো না, যদি তুমি ক্ষরণের
রক্তে ভেসে যাও। যদি ভেসে যাও।

আমাকে কী মাল্য দেবে, দাও

তোমার পায়ের নিচে আমিও অমর হবো,
আমাকে কী মাল্য দেবে, দাও।

এই নাও আমার যৌতুক, এক-বুক রক্তের প্রতিজ্ঞা।
ধুয়েছি অস্থির আত্মা শ্রাবণের জলে, আমিও প্লাবন হবো,
শুধু চন্দনচর্চিত হাত একবার বোলাও কপালে।
আমি জলে-স্থলে-অন্তরিক্ষে উড়াবো গাণ্ডীব,
তোমার পায়ের কাছে নামাবো পাহাড়।
আমিও অমর হবো, আমাকে কী মাল্য দেবে, দাও।

পায়ের আঙুল হয়ে সারাক্ষণ লেগে আছি পায়ে,
চন্দনের ঘ্রাণ হয়ে বেঁচে আছি কাঠের ভিতরে?
আমার কিসের ভয়?

কবরের পাশে থেকে হয়ে গেছি নিজেই কবর,
শহীদের পাশে থেকে হয়ে গেছি নিজেই শহীদ,
আমার আঙুল যেন শহীদের অজস্র মিনার হয়ে
জনতার হাতে হাতে গিয়েছে ছড়িয়ে।
আমার কিসের ভয়?

তোমার পায়ের নিচে আমিও অমর হবো,
আমাকে কী মাল্য দেবে, দাও।
এই দেখো অন্তরাত্মা মৃত্যুর গর্বে ভরপুর,
ভোরের শেফালি হয়ে পড়ে আছে ঘাসে।
আকন্দ-ধুন্দুল নয়, রফিক-সালাম-বরকত-আমি;
আমারই আত্মার প্রতিভাসে এই দেখো আগ্নেয়াস্ত্র,
কোমরে কার্তুজ, অস্থি ও মজ্জার মধ্যে আমার বিদ্রোহ,
উদ্ধত কপাল জুড়ে যুদ্ধের এ-রক্তজয়টিকা।

আমার কিসের ভয়?
তোমার পায়ের নিচে আমিও অমর হবো,
আমাকে কী মাল্য দেবে, দাও।

তুমি চলে যাচ্ছো

তুমি চলে যাচ্ছো, নদীতে কল্লোল তুলে লঞ্চ ছাড়ছে,
কালো ধোঁয়ার ধস ধস আওয়াজের ফাঁকে ফাঁকে
তোমার ক্লান্ত অপসৃয়মাণ মুখশ্রী, — সেই কবে থেকে
তোমার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রয়েছি।
তুমি চলে যাচ্ছো, তোমার চলে যাওয়া কিছুতেই
শেষ হচ্ছে না, সেই কবে থেকে তুমি যাচ্ছো, তবু
শেষ হচ্ছে না, শেষ হচ্ছে না ।

বাতাসের সঙ্গে কথা বলে, বৃষ্টির সঙ্গে কথা বলে
ধলেশ্বরীর দিকে চোখ ফেরাতেই তোমাকে আবার দেখলুম ;
আবার নতুন করে তোমার চলে যাওয়ার শুরু ।
তুমি চলে যাচ্ছো, নদীতে কল্লোল তুলে লঞ্চ ছাড়ছে,
কালো ধোঁয়ার ফাঁকে ফাঁকে তোমার ক্লান্ত অপসৃয়মাণ
মুখশ্রী, যেন আবার সেই প্রথমবারের মতো চলে যাওয়া ।
তুমি চলে যাচ্ছো, আমি দুই চোখে তোমার চলে যাওয়ার
দিকে তাকিয়ে রয়েছি, তাকিয়ে রয়েছি ।

তুমি চলে যাচ্ছো, নদীতে কান্নার কল্লোল,
তুমি চলে যাচ্ছো, বাতাসে মৃত্যুর গন্ধ,
তুমি চলে যাচ্ছো, চৈতন্যে অস্থির দোলা, লঞ্চ ছাড়ছে,
টারবাইনে বিদ্যুৎগতি ঝড় তুলছে প্রাণের বৈঠায় ।
কালো ধোঁয়ার দূরত্ব চিরে চিরে ভেসে উঠছো ।
তোমার চলে যাওয়া কিছুতেই শেষ হচ্ছে না,
তিন হাজার দিন ধরে তুমি যাচ্ছো, যাচ্ছো আর যাচ্ছো ।

২

তুমি চলে যাচ্ছো, আকাশ ভেঙে পড়ছে তরঙ্গিত
নদীর জ্যোৎস্নায়, কালো রাজহংসের মতো তোমার নৌকো
কাশবনের বুক চিরে চিরে আখক্ষেতের পাশ দিয়ে
যাচ্ছে অজানা ভুবনের ডাকে । তুমি চলে যাচ্ছো,
আকাশ ভেঙে পড়ছে আকাশের মতো।
হে তরঙ্গ, হে সর্বগ্রাসী নদী, হে নিষ্ঠুর কালো নৌকো,

তোমার মাথায় তুলে যাকে নিয়ে যাচ্ছো ;
সে আমার কিছুই ছিল না, তবু কেন সন্ধ্যার আকাশ
এরকম ভেঙে পড়লো নদীর জোৎস্নায় ?
ভেঙে পড়লো জলের অতলে ? তুমি চলে যাচ্ছো বলে ?

৩

তুমি চলে যাচ্ছো, ল্যাম্পপোষ্ট থেকে খসে পড়ছে বাল্ব,
সমস্ত শহর জুড়ে নেমে আসছে মাটির নিচের গাঢ় তমাল তমসা ।
যেন কোনো বিজ্ঞ-জাদুকর কালো স্কার্ফ দিয়ে এ শহর
দিয়েছে মুড়িয়ে । দু'একটি বিষন্ন ঝিঁঝিঁ ছাড়া আর কোনো গান নেই,
শব্দ নেই, জীবনের শিল্প নেই, নেই কোনো প্রাণের সঞ্চার ।
এ শহর অন্ধ করে তুমি চলে যাচ্ছো অন্য এক দূরের নগরে,
আমি সেই নগরীর কাল্পনিক কিছু আলো চোখে মেখে নিয়ে
তোমার গন্তব্যের দিকে, নীলিমায় তাকিয়ে রয়েছি ।
তুমি চলে যাচ্ছো, তোমার বিদায়ী চোখে, চশমায় নূহের প্লাবন ।
তুমি চলে যাচ্ছো, বিউগলে বিষন্ন সুর ঝড় তুলছে
অন্তর্গত অশোক কাননে । তুমি চলে যাচ্ছো, তোমার পশ্চাতে
এক রিক্ত, নিঃস্ব মৃতের নগরী পড়ে আছে ।

৪

অনন্ত অস্থির চোখে বেদনার মেঘ জমে আছে,
তোমার মুখের দিকে তাকাতে পারি না ।
তোমাকে দেখার নামে তোমার চতুর্দিকে পরিপার্শ্ব দেখি,
বিমান বন্দরে বৃষ্টি, দু'চোখ জলের কাছে ছুটে যেতে চায়,
তোমার চোখের দিকে তাকাতে পারি না ।

৫

তুমি চলে যাচ্ছো, আমার কবিতাগুলো শরবিদ্ধ
আহত সিংহের ক্ষোভ বুকে নিয়ে পড়ে আছে একা ।
তুমি চলে যাচ্ছো, কতগুলো শব্দের চোখে জল ।

তুমি চলে গেলে

তুমি চলে গেলে আমি এলোমেলো হয়ে যাই,
আপ্যায়নের ত্রুটি চোখে পড়ে, যদি তুমি কষ্ট পেয়ে থাকো ।
যে দগ্ধ সিগারেট তুমি পদতলে মাড়িয়ে দিয়েছিলে, আমি তাকে
তুলে এনে পকেটে রেখেছিলাম, যে টুকরো কাগজে তুমি
আমার নাম লিখেছিলে, আমি তাকে বৃষ্টির মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম।
বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে ওটা আবার সেই কাগজ হয়ে উঠেছিল;
তুমি যদি কষ্ট পেয়ে থাকো । চলে গেলে এইসব এলোমেলো ভাবি,
আপ্যায়নের ত্রুটি চোখে পড়ে, ভাবি যতটুকু দাবি ছিল
আমি তার কতটুকু মিটাতে পেরেছি ?

রেস্তোরাঁ, ঝড়ের নদী, ফাঁকা ধু ধু জল আমাকে বিদ্রুপ করে ,
আমি এলোমেলো হয়ে যাই, কোলাহল করে ওঠে দ্বিধাগ্রস্ত প্রাণ,
রবীন্দ্রনাথের গান দিয়ে তোমাকে কি বোঝাতে পেরেছি ?
সাজানো কথার রাজ্যে যতটুকু আমি,
তুমি তার কতটুকু গ্রহণ করেছো?

তুমি চলে গেলে ভাবি, এলোমেলো হয়ে যাই।
সাজিয়ে কবির মতো বোঝাতে পারি না,
চলে গেলে কথা আসে, প্রেম আসে, বুদ্ধি আসে,
—হায়রে নিয়তি !

উপেক্ষা

অনন্ত বিরহ চাই, ভালোবেসে কার্পণ্য শিখি নি।
তোমার উপেক্ষা পেলে অনায়াসে ভুলে যেতে পারি
সমস্ত বোধের উৎস গ্রাস করা প্রেম ; যদি চাও

ভুলে যাবো, তুমি শুধু কাছে এসে উপেক্ষা দেখাও ।
আমি কি ডরাই সখি, ভালোবাসা ভিখারি বিরহে ?

আমার কিছু স্বপ্ন ছিল

আমার কিছু স্বপ্ন ছিল, আমার কিছু প্রাপ্য ছিল,
একখানা ঘর সবার মতো আপন করে পাবার,
একখানা ঘর বিবাহিত, স্বপ্ন ছিল রোজ সকালে
একমুঠো ভাত লঙ্কা মেখে খাবার ।

সামনে বাগান, উঠোন চাই নি, চেয়েছিলাম
একজোড়া হাঁস, একজোড়া চোখ অপেক্ষমান ।
এই তো আমি চেয়েছিলাম ।

স্বপ্ন ছিল স্বাধীনতার, আর কিছু নয়,
তোমাকে শুধু অনঙ্গ বউ ডাকার ।
চেয়েছিলাম একখানি মুখ আলিঙ্গনে রাখার ।

অনঙ্গ বউ, অনঙ্গ বউ, এক জোড়া হাঁস,
এক জোড়া চোখ. কোথায়? তুমি কোথায় ?

পিপীলিকা

প্রয়োজন ছিল না মোটেও, তবুও সঞ্চয় জানি
চিরকাল বেজ্ঞজনোচিত । আপাতত ধরে থাকি
পরিণাম পরে দেখা যাবে, এই ভেবে মানুষের মতো
এক মুগ্ধ-পিপীলিকা আনন্দে আগলে রাখে
ব্যাকুল চোখের কোণে লুক্কায়িত চিনির হরিণ ;
যেমন তোমাকে আমি এই প্রয়োজনহীন পরবাসে ।

এখনো বাসিনি ভালো পুরোপুরি,
আয়ত্তে রেখেছি কিছু অন্তরঙ্গ বোধের বাসনা ;
কল্পনায় ঘিরে আছি অন্ধ-যৌন রূপের কংকাল ।
যদি ব্যর্থ হই এরকম নিঃসঙ্গ খেলায়
কুরে খাবো চর্ব্যচোষ্য লাবণ্য তোমার,
আলিঙ্গন ভরে দেবো অজস্র বাহুর পিপীলিকা ।

সবাই পড়েছে প্রেমে, আমি সকলের চেয়ে কিছু বেশী ।

এক দুপুরের স্বপ্ন

দুঃসাহসে কিনে ফেলি, তা না হলে কিছুই হতো না ।
কেনা হয়ে গেলে অভ্যন্তরে স্বস্তি পাই,
মোটামুটি চলে কিছুদিন. ।

টানাটানি যদি আসে প্রেমিকার শাড়ির প্রতীকে
সংসার আনন্দ পায়, আমি তাই আমার সংসার
জীবনযাপন রীতি খোলা রাখি চতুর্দিক থেকে ।
কী আছে এমন, সবাই দেখুক ।
এইভাবে শূন্যতাকে জনস্রোতে ধারণ করেছি।
জ্ঞানের পরিধি পেলে না পেলেও স্বপ্ন সুখী হয়,
সুখে - সুখে পূর্ণ হয় একা থাকা মনুষ্যজীবন।
নিজেরই বাগান বাড়ি ভেবে - ভেবে তিনদিন - তিনরাত্রি
কেটে গেছে গণভবনের আশেপাশে,
তাতে কারো ক্ষতি নেই, আমি কি কখনো বলি
সত্যি-সত্যি এ বাড়ি আমার?
এই-যে কিনেছি পার্ক গতকাল, আজ তার লেখাপড়া
হবে, আমি লেখাপড়া ভালোবাসি, ভালোবাসি
রেজিস্ট্রিকরণ-প্রথা, পাকাপোক্ত ঘর।

২

প্রথমে পছন্দ করি, তারপর তীব্র করে কাছে পেতে চাই।
তীব্রতা তাড়িত করে জীবনের মূলে রাখে হাত,
পাতার আড়াল থেকে দু'একটা চড়ুই কিম্বা একশ' দু'শো
টাকা অনায়াসে তখনই সম্ভব।
সেই সূত্রে কিনে ফেলি পৌরাণিক হাঁস,
সোনা ও রূপার ডিমে ক্রমে-ক্রমে পূর্ণ হয়ে উঠি, অর্থাভাব
চলে যায়, সচ্ছলতা ফিরে আসে ডিমালু হাঁসের মতো
পদতল বাজাতে-বাজাতে। নিজের স্বপ্নের কাছে
এইভাবে জয়ী হই, এইভাবে পরাজিত হই।

৩

এই তো একটু আগে একটি শালিখ এসে ঝিলের রঙিন জলে
স্নান শেষে রোদ্দুরে মেলেছে ভেজা চুল, মেয়েদের মতো।
এতো কালো দীর্ঘ চুল যেন শুধু শালিখের সম্ভব।
আকাশ করেছে চুরি শালিখের খুলে-রাখা বুকের কাঁচুলি,
এই দৃশ্য বড়ো বেশি মনোমুগ্ধকর, বড়ো বেশি কল্পনাপ্রবণ;
তাই সহ্য হয় না, তবু সত্য সমাদৃত নিজের ভিতরে,
ভালোবাসি কখনো কখনো সত্য-রমণীর চেয়ে।
পাখিকে প্রেমিকা ভেবে মাঝে মাঝে খুব বেঁচে যাই।

তোমার ভূমিকা মানি, স্বাধীনতা যুদ্ধে যেরকম
বাংলাদেশে নদীর ভূমিকা চিরায়ত।
ভালোবাসা আল ভাঙ্গে কোণ-সেচা জলে,
অন্যকে প্লাবিত করে নিজেকে বাঁচায়, বাড়ায়, খেলে,
প্রসারিত করে ক্রীড়াযোগ্য ভূমি।

তখন জাগ্রত চরে ভালোবেসে মুখ তোলো তুমি।

যতুটকু প্রেমে

বৈরীতে বিশ্বাসী নই, হিংস্রতা মানায় সিংহে, বনরাজে,
তাই জীবজ্ঞানে ক্ষমা করি সব অরণ্যের ক্ষিপ্র ব্যাভিচার ।
সিংহ নই, ছড়ানো ভুবন জুড়ে প্রেমার্ত বোধের অশ্ব ছোটে
প্রতিদিন । রেশমী কেশর থেকে ঝরে নিত্য মানবিক ক্ষুধার
চুম্বন । সিংহের শোণিত বীর্যে তবু ফের ধুয়ে আসি হৃদয়ের
পরাজিত ভীরুতা আমার । প্রকৃত বিশ্বাস নেই প্রকৃতির
বৈরী বসবাসে, হিংস্রতায় নহি পারঙ্গম, তাই যতটুকু প্রেমে ।

কৃষ্ণচূড়াঞ্জলি

১
এ প্রেম যেখানে সত্য সেই স্নিগ্ধ নদীর কিনারে
বিকেলে বিছিয়ে রাখি তোমার উজ্জ্বল সোনামুখ।
নোনাজল যে ক্ষেতে প্রবেশ করে তার শস্য জ্বলে যায়,
এ কথা জেনেও এই জন্মে ভালোবাসা ধারণ করেছি।

২
তোমাকে ভুলেছি স্বপ্নে, প্রেমে, অভ্যাসে, বেদনায়।
এখন বুকের মাঝে বন্ধন মুক্তির মৃদু হাওয়া,
হাত তুলে অনায়াসে বিদায় দিয়েছি গত রাতে।
সুখে আছি, সুখলতা, বেঁচে থেকে বেদনা সহিতে।

৩
ভাসতে ভাসতে শীতলক্ষ্যা, ভাসতে ভাসতে পদ্মা,
পদ্মা থেকে ভাসতে ভাসতে একটানা এক নদী।
ভাসতে ভাসতে ভালোবাসা, ভাসতে ভাসতে দোলা,
একটিমাত্র নৌকা আমার ভাসতে ভাসতে যায়।

৪
প্রেম বড়ো প্রাকৃতিক তাই এত বসন্ত কাতর,
হাওয়া খায় চুলে ও বকুল। ফল চেয়ে ঝরে বোল,
যেরকম অকাতরে তোমার ভিতরে ঝরি আমি।
প্রেম বড়ো পরান্মুখ, তাই এত আমার অধীন।

৫
অনেক দূরের মানুষকে ভাবি কাছে,
এমন কিছুটা অপরাধ আজো আছে;
বুকের পাশের সত্যকে ভাবি, নেই।

৬
অলিখিত চুমু আকাশে ছড়াই
ভাবি বুঝি কেউ গিললো,

হায়রে আমার দুর্বল তৃষা
আহা কী যে বালখিল্য ।

৭
তুমি লহ নাই ভালোবাসিবার দায়,
দু'হাতে শুধুই কুড়িয়েছো ঝরা ফুল ।
কৃষ্ণচূড়ার তলে, আমি বসে একা ।
বুনিয়াছি প্রেম ঘৃণা বুনিবার ছলে ।

৮
এই আঁধারে অচেনা মুখ শেখার
দায়িত্ব কি সহজ বলে ভাবো ?
ঠিকানাহীন তোমাকে চিঠি লেখার
কোথায় এতো সাহস খুঁজে পাবো ?

৯
ফুলগুলিকে ভালোবাসি, তাই তুলি না,
মুখগুলিকে লুকাই মরা ঘাসে ।
ভুলগুলিকে নিজের ভাবি, তাই ভুলি না,
বেদনা পাই তোমার পরবাসে ।

১০
দু'টি গোলাপই তুমি দিয়ে বসে আছো,
আমার কবরে তুমি কোন্ গোলাপটি দেবে ?

১২
যে কোনো সুর বাজাতে পারি
একটুখানি বীণায়,
যখন তুমি আঘাত করে
জাগিয়ে তোলো ঘৃণায়।

১৩
আমার কথা ভাবি নে আর প্রিয়
ভাবনা তোমার জন্যে,

তোমাকে কিছু বুঝিতে চাই
পাছে ভুল বুঝে সব অন্যে ।

১৪
আর কতদিনেপ্রস্তুত হবে তুমি ?
ধ্রুব জীবনের নদীতে পড়েছে চড়া,
হাঁকে পুরোহিত খড়গের ধার চুমি
সাজানো হয়েছে যজ্ঞের কাঠগড়া ।

১৫
তুমি এসে যবে ভালোবেসে যাও
নতুন তমি'র মাঝে,
বুঝি এই প্রেম কোথাও একটু
ঐক্যের মতো বাজে।

১৬
এই নাম এত প্রিয় হবে,
এত কান্নাময় হবে, কে জানতো ?
এই জন্ম এত পূর্ণ হবে,
এত প্রিয়ময় হবে, কে জানতো ?

১৭
তোমার প্রেমের স্পর্শ
গ্রহণ করেছি বুকে-পিঠে,
যেমন অগ্নির দাহ
চুল্লিতে, চিমনীতে পোড়া ইটে ;

১৮
ঐ সব ফুলগুলি কি জানে, কেন ?
তুব ফুটে আছে যেন কৃষ্ণচূড়াগুলি !
আমি জানি কেন জন্ম, কেন মৃত্যু,
কার তরে অপেক্ষা আমার, তবু ঐ
কৃষ্ণচূড়ার মতো ফুটে আছি কই ?

১৯
নিজ থেকে তুমি দাও না কিছুই
ভীরু বেদনার একখানি জুঁই
সাথে নিয়ে আসি,
তোমাকে শোনাই বিরহের গান
যদিও অন্ধ প্রেমে বিশ্বাসী ।

২০
সারাদিন তবু কাটে
সন্ধ্যা ঠেকে যায়,
ভালোবাসাহীন তবু বাঁচি
ভালোবাসা পেলে মরে যাই।

২১
এরকম ভাবাটা কি অন্যায়
একটি রাত্রি আমারও ছিল?
মৃদু মেঘে মাখা তারা চঞ্চল
সেই রাত্রিটি তোমারই দেয়া ।

২২
তাকেই বলি আমার কৃষ্ণচূড়াগুলি
কৃষ্ণকলি বলে যারা দূরের লোক,
যেমন সেই রবীন্দ্রনাথ, কালো মেয়ের
ভালোবাসায় ব্যর্থ হয়ে বলেছিলেন :
'কালো তা সে যতই কালো হোক .'

২৩
কাগজের দু'টো পৃষ্ঠার মতো প্রেম,
কোনোদিন কেউ ছোঁবে না পরস্পর ।
চোখের কৃষ্ণ বৃত্ত ঘিরেছে সাদা,
ভালোবাসা তবু আমার ভিতরে একা ।

২৪
খুব সামান্য দূরে আছি

এক বিঘতও হইবে না,
তাতেই এত নিঃসঙ্গ ভাব
এরচে' অধিক সইবে না ।

২৫
এত যে আমি ওখানে যাই
ওখানে পাই কাছে,
ওখানে তার পায়ের কিছু
চিহ্ন পড়ে আছে ।

নাম দিয়েছি ভালোবাসা

অসম্ভব বাহুর আলিঙ্গনে আমরা জড়িয়ে রেখেছি পরস্পরকে ।
আমাদের চারপাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে সেইসব বিরোধী তরঙ্গ, যার টানে
আমরা আলাদা হয়ে যেতে পারি চিরকালের ভিড়ে, অচেনায়।
বুক থেকে এক-একবার মুখ সরে যেতে চায় । চোখ এই অল্পের মধ্যে
আর তাকাতে চায় না, অভিমান ফিরে ফিরে আসে । স্ক্রীন কভারের
মতো অন্ধকার ভুলে যেতে থাকে ; গন্ধরাজের পাপড়িতে তার প্রথম স্পর্শ ।
আমাদের যূথবদ্ধ অনুভূতির মালা গাঁথা না হতেই ঝরে যাবার বেদনায়
আমরা তখন ককিয়ে উঠি, আমাদের কোনো কথাই তখনও বলা হয় নি ।
সমস্ত প্রয়োজনকে অপূর্ণ রেখে, তোমার চোখের শিশিরে মুখ ধুয়ে,
আমাকে বিদায় দিয়ে, তোমাকে নিয়ে ফিরে আসি একা, কবরের পাশের
সেই একলা অন্ধকারে—যেখানে একটি পুরোনো ভাঙা দালানের চারপাশে
আমি তিল তিল করে গড়ে তুলেছি আমার ভালোবাসার জীবন্ত জাদুঘর।
সেই রাত্রির নিদ্রাহীনতায় আমি এক পরমের দেখা পেয়েছিলাম,

সেই পরমের স্পর্শে আমি এখন অহংকারে মাতাল হয়ে উঠেছি,
তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি সেই পরমের নাম দিয়েছি ভালোবাসা ।
যদি সেই রাত্রিটিকে তুমি ঘষে ঘষে অনন্তের পাতা থেকে কোনোদিন
মুছে ফেলতে পারো, আমি ভালোবেসেও তোমাকে বিরহ বলে ডাকবো ।

২
ঝড়োরাত্রির খোলা জানালার মতো
ঝাপটা হাওয়ায় তোমার দেহের

দেয়ালে কুটেছি মাথা ।
বুক ভেঙে গেছে বিদায়ের করাঘাতে,
ভাঙতে ভাঙতে দেয়ালে পলস্তারা
খসে গেছে বালি শব্দের কড়িকাঠে ।
ভোর হয়ে গেছে পুবের আকাশে
পাখিদের মুখে গান, চাঁদ ডুবে গেছে
মৃত্যুর মতো, শেষ-কথা তবু নেই ?

৩

এখন আমার এই চামচটাকে খুব ভালো লাগছে, আর কিছু নয়,
আর সমস্ত কিছুতে ক্লান্তি, তোমাতেও।
তুমি ঐ চামচে লেপ্টে থাকা চিনিতে চুমু খেয়েছিলে, সাদা নিকেলে
তোমার সেই লাল জিভের দাগ এত স্পষ্ট ; 'তুমি কি বিড়াল ?''
আমি এই চামচটাকে এখন একটু নাড়াচাড়া করে দেখেছি,
তুমি ততক্ষণে টয়লেট থেকে তোমার কাজল মাখানো মুখটাকে
ধুয়ে এসো, — কেউ বুঝতে পারবে না।
সম্ভব হলে এই ফাঁকে আমি চামচটাকে চিরকালের জন্যে পকেটে
পুরে নেবো । যদি আমরা কোনোদিন ভালোবাসায় অভিজ্ঞ হয়ে উঠি,
এই চামচটা আমাদের প্রথম ক্লান্তির সাক্ষী হয়ে থাকবে ।

৪

শুধু ঐ রেস্তোরাঁটি এখনো আমার ।
ওর টানে এখনো অন্তিম বেগে ছুটে যাই,
আম কাঁঠালের ছুটি শেষ করে মামাবাড়ি-
-ফেরা কিশোর যেমন জননীর কাছে ।
আধো অন্ধকারে ফ্রায়েড চিকেনের মতো
মৃত মুখে মুখোমুখি স্মৃতিরা দাঁড়ায় ।
তোমার রক্তিম মুখ ফুটে ওঠে
কার্পেটের ফুলের ভিতরে, যদি মনে পড়ে,
যদি কোনো ভুলে-যাওয়া দৃশ্য মনে পড়ে ।

৫

আমি কী নির্দ্বিধায় তোমার করতলে একটি শব্দকে
তখন মুখর করে তুলেছি, প্রিয়তমা।

তুমি নিমীলিত হয়ে এলে লজ্জায়, যেন বা সন্ধ্যার
পরিজাত তার আজন্ম মুখর পাপড়ি
গুটিয়ে নিয়েছে বুকে, কীর্তিনাশার দিকে ।

তোমার কানের কাছে কুন্তলে মুখ ঢেকে
আমি মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করলুম
আমার আজন্ম লালিত স্বপ্ন : 'ভালোবাসি।'
তুমি কেঁপে উঠলে যেন সঙ্গমের প্রথম শিহরণ
কুমারীর । স্পর্শ ও আবেগের উত্তাপে বৃষ্টি হয়ে
ঝরে গেলো চৈত্রের ছিন্ন মেঘমালা।

তুমি কোনো শব্দই উচ্চারণ করতে পারলে না ।
আমার হাতের কালো তিলকটি নিয়ে অনর্থক
ব্যস্ত হয়ে উঠলে, যেন ঐ তিলটি ভীষণ একা,
তোমার হাতের ছোঁয়া না পেলেই শূন্যে উড়ে যাবে ।

৬

ভালোবাসা কই, এ তো মৃত্যুর মুখোমুখি
কল্পনা ছুঁয়ে ক্লান্তির কাছে যাওয়া,
বাসনার মুখে অঙ্গার জ্বেলে-জ্বেলে
ওষ্ঠের লাল অমৃতে চুমু খাওয়া ।
ভালোবাসা কই, এ তো জন্মের প্রবণতা,
পাতালের কালো মাটিতে মাখানো শিশু।
জীবনকে দেয় জীবনের হাতে তুলে,
এ-তো উদাসীনতার এপ্রিলে পাওয়া যীশু ।

ভালোবাসা কই, এ-তো ধর্মের চেয়ে প্রিয় ।

৭

তোমার ঐ কোমরের নিচে নাভিমূল ছিন্ন করে
আমি একবারও তাকাতে পারিনি,
আমার সমস্ত দৃষ্টি তোমার ঐ সুমুখের সুষমায়
ভালোবেসে বন্দী হয়েছিল । এ কি কারাগার ?
আমি চুল-চোখ-নাক, আমি যে ঠিক কিসের দিকে

তাকিয়ে তাকিয়ে এত বেশী ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলাম ।
আমার দু'খানা চোখ তোমার কটিতে এসে
অবাক শিশুর মতো মাথা পেতে ঘুমিয়ে পড়েছিল,
যেরকম মা'র কোলে একবার সুদূর শৈশবে, সিনেমায় ।
তুমি তো জননী নও, জাগালে না কেন ?

৮
তোমাকে এমন হঠাৎ ভাবি কেন ?
তোমাকে আমি জন্ম থেকে চিনি
বাংলাদেশের তুলনামূলক রূপে
যদি বা তুমি দেখতে বিদেশিনী ।
তোমাকে এমন হঠাৎ ভাবি কেন ?
তুমি আমার বিভূঁই বিষ্ণুপ্রিয়া,
অবাক করা চোখের চাহনিতে
তোমাকে আমি চিনেছি, ওফেলিয়া ।
তুমি আমার জীবন ভরে আসা
নদীর মতো মদিরে কল্লোল,
চৈত্রে ফোটা কৃষ্ণচূড়ার ফুল
তুমি কি তবু হঠাৎ ভালোবাসা ?
তোমাকে এমন হঠাৎ ভাবি কেন ?

৯
কয়েক টুকরো মিনি আগুন ছুঁড়ে দিয়ে
বাসটা হাওয়া হয়ে গেলো চোখের পলকে ।
বাতাসে ঘুরপাক খেতে খেতে একটি ছাড়া
সব স্ফুলিঙ্গই গেলো নিভে ; তখন কালো
পাতার আড়াল ভেঙ্গে ফুটে উঠলো
একটিমাত্র জ্বলন্ত ব্রাউনিয়া।

১০
যেখানে আমি গিয়েছিলাম
সেখানে জল মাটির চেয়ে বেশী,
মানুষ কেন, পাখিও নেই,
তুমিই ছিলে একলা এলোকেশী ।

তাকিয়ে দেখি তোমার দু'টি
বিশাল কালো চোখ,
দিন দুপুরে চেঁচিয়ে উঠি
একটা কিছু হোক ।
চোখ তো নয় কালবোশেখী
মেঘের চেয়ে বড়,
মাটির দিকে তাকিয়ে থেকে
কাঁপলো থর-থর ।
ফুলের তলা উঠলো বেজে
বৃষ্টিমাখা গানে,
বাতাস হয়ে ঝলসে উঠি
গোপন অভিমানে ।
চোখের কোণে চিহ্ন খুঁজে
এগিয়ে গেছি যেই,
আকাশ থেকে বোল্‌লে তুমি
ধুলোতে আমি নেই ।

১১

আমরা মিশিনি ভালোবেসে সব
মানুষ যেভাবে মেশে,
আমরা গিয়েছি প্রাজ্ঞ আঁধারে
না-জানার টানে ভেসে ।

ভাসতে ভাসতে আমরা ভিড়িনি
যেখানে নদীর তীর,
বনোবাসনার উদ্বেল স্রোতে
আশ্লেষে অস্থির ।

আমরা দু'জনে রচনা করেছি
একে অপরের ক্ষতি,
প্রবাসী প্রেমের পাথরে গড়েছি
অন্ধ অমরাবতী।
আমরা মিশিনি বিহ্বলতায়
শুক্রে-শোণিতে-স্বেদে,
আমাদের প্রেম পূর্ণ হয়েছে
বেদনায়, বিচ্ছেদে ।

১২

প্রেমান্ধ রাত্রির স্মৃতি সামলাতে - সামলাতে এই জন্ম
মমতায় ক্লান্ত হয়ে আসে, তোমাকে হারানো সুখে
মাথা কুটে মুখোমুখি শিশির ঝরাই মরা ঘাসে ।
সামলাতে সামলাতে হাত মমতায় ক্লান্ত হয়ে আসে ।
কত আর ধরে রাখি এই একা দু'জনের স্মৃতি,
বাক্‌বন্ধে, রাহুগ্রাসে, হে আমার প্রেমের নিয়তি
আকাশও পারেনি তার সব ক'টি নক্ষত্রের পতন ফেরাতে ;
আমি কোন্ ছার ? কল্পনার অধিক দুর্বার স্মৃতিগুচ্ছ
ঝরে গেছে বিস্মৃতির মুখে, জেগেছে ঢেউয়ের মুখে
সৈকতের ফেনা—মৃতের করোটি এসে বলে গেছে
সমুদ্রের কানে : 'সবকিছু ফিরে পাবে, কিচ্ছু হারাবে না।'

সময় হারায় সব, যাতনা বাড়ায় যবে অক্ষমের ভাষা ।
দু'জনের স্মৃতি বয়ে একা ফিরে আসা তবু কি অসহ্য মনে হয় ?
কে যেন ভিতর থেকে শূন্যে ছুটে যায়, তোমার বিদায়ী পায়
চুমু খায় রাত্রি জাগা ভোরের বাতাস, ভুলে যাই শেষ দীর্ঘশ্বাস,
ভুলে যাই সেই লগ্নে কান্নার ভিতরে কোনো চোখ ছিল কিনা ।
তীরের তরঙ্গ এসে বলে যায় সমুদ্রের কানে :
'সব প্রেম ফিরে পাবে, কিচ্ছু হারাবে না ।'

১৩

আমরা নদীর মতো ছুটে গেছি সমুদ্রের দিকে,
কী করে লুকোবে মুখ? জলের ভিতরে আছে মাছ,
তারা জানে কারা সব ভালোবেসে আসে এইখানে ।
আমার সমুদ্র ছিল একখানি চীনা রেস্তোরাঁয়,
ওখানে গর্জন নেই, গান ছিল রবীন্দ্রনাথের ।
দু'একটা অতুল ছিল তুমি যাতে পা-ডুবিয়ে মাথা
নেড়ে বলেছিলে, ভালো ; আমি বাসী বকুলের ফুলে
হাত রেখে ডুবে আছি সেই থেকে গানের ভিতরে ।
কার্পেটে ফুটেছে বেলী, আমি তার সদ্যফোটা কলি
তুলে নিয়ে পরিয়েছি কোমলতা যেখানে মানায় ।
আমার চেয়েও তুমি আনারস খেয়েছিলে বেশী,
যেন আমি প্রেম নই, প্রকৃতই মানুষ সেজেছি ।
যখন ভুলিবে তুমি, আমি যাবো সমুদ্রের দিকে,
আমার সমুদ্র আছে একখানি চীনা রেস্তোরাঁয় ।

স্মরণ

নাম ভুলে গেছি, দুর্বল মেধা
স্মরণে রেখেছি মুখ ;
কাল রাজনীতে চিনিব তোমায়
আপাতত স্মৃতিভুক্‌ ।

ডাকিব না প্রিয়, কেবলি দেখিব
দু'চোখে পরাণ ভরে ;
পূজারী যেমন প্রতিমার মুখে ।
প্রদীপ তুলিয়া ধরে ।

তুমি ফিরে যাবে উড়ন্ত রথে
মাটিতে পড়িবে ছায়া,
মন্দির খুঁড়ে দেখিব তোমায়
মন্দ্রিত মহামায়া ।

ভুলে যাব সব সময়-নিপাতে
স্মরণে জাগিবে প্রেম,
আঁধারে তখন জ্বলিবে তোমার
চন্দনে মাখা হেম ।

আক্রোশ

আকাশে তারা ছিঁড়ে ফেলি আক্রোশে
বিরহের মুখে স্বপ্নকে করি জয়ী,
পরশমথিত ফেলে আসা দিনগুলি
ভুলে গেলে এত দ্রুত, হে ছলনাময়ী

পোড়াতে পোড়াতে চৌচির চিতা নদী
চন্দনবনে অগ্নির মতো জ্বলে,
ভূকম্পনের শিখরে তোমার মুখ
হঠাৎ স্মৃতির পরশনে গেছে গলে ।

ফিরে গেলে তবু প্রেমাহত পাখি একা,
ঝড় কি ছিলো না সেই বিদায়ের রাতে ?
ভুলে গেলে এত দ্রুত, হে ছলনাময়ী,
পেয়েছিলে তাকে অনেক রাত্রিপাতে ।

শব্দের চোখে করাঘাত করি ক্রোধে
জাগাই দিনের ধূসর প্রতিচ্ছবি ।
না-পাওয়া মুখের মুখর সুষমা দিয়ে,
তবুও তোমার ছলনা-আহত কবি
তোমাকেই লেখে, তোমাকেই রচে প্রিয়ে !

নবাগত নক্ষত্রের আলো

যে সকল নক্ষত্রের আলো এতদিন দেখেনি পৃথিবী,
আজ সেই অক্ষমের চোখ অকস্মাৎ খুলে গেছে
আশ্বিনের চাঁদের আঘাতে । পৃথিবীর সমস্ত বিদ্যুৎ
আজ পরাজিত, যেন দিগ্বিজয়ী একটি আলোর অশ্ব
ছুটে যাচ্ছে, ছুটে যাচ্ছে, ছুটে যাচ্ছে .....।

তার সে অপ্রতিরোধ্য গতির পুলকে,
ক্ষুরাঘাতে প্লাবিত হয়েছে বিশ্ব ; আমি দগ্ধ ঐশ্বরিকে
শব্দহীন, আলোর ঔজ্জ্বল্য চোখে নিয়ে
নদী তীরে বসে আছি একা,
আমার চতুর্দিকে সেইসব নবাগত নক্ষত্রের আলো ।

পশ্চাতে নানান চাঁদে একখানি কুয়াশার মালা গাঁথা হচ্ছে
জীবনানন্দীয় ধানক্ষেতে, — একে কি প্লাবন বলে ?
মেঘের আঙিনা থেকে ঐ যে বাঙালিনী আলো দিচ্ছে
নদীর ভিতরে, একি শুধু চাঁদ, বহুজন ব্যবহৃত চাঁদ শুধু ?

একটি হিজল পাতা ভেসে যাচ্ছে চাঁদের আলোয়,
যেন ছিন্ন পাতা দিয়ে সাজানো তরণী কোনো
নিঃসঙ্গ প্রেমিকের ; ভেসে যাচ্ছে কাশবন থেকে
যোগীশাসনের দিকে, এক তীব্রতমা হিজলের ডাকে ।

এ কি শুধু নদী, শুধু নদী? জেলেদের গাবমাখা জালে
মাছের বদলে উঠে আসে আশ্বিনের চাঁদ
এত ভ্রান্তি চন্দ্রলোকে, চাঁদের জ্যোৎস্নায় ?
গাঙের তলার মাটি প্রিয়ার মুখের মত স্পষ্ট বেদনায় জাগে,
একটু আঁধার শুধু থেকে যায় ছাতিমের নতুন পাতায়—;
যারা দেখে নাই এই রাত্রি, এই আলো,
তাহাদের মনের মতন ।
এই রাত্রি যেন দিন, যেন বিরহবিলীন ভোরবেলা,
যেন রাত্রি নয় ।

হাসানের জন্যে এলিজি

প্রেমিকারা নয়, নাম ধরে যারা ডাকে তারা ঝিঁঝিঁ,
তাদের যৎসামান্য পরিচয় জানা থাকা ভালো ;
বলতেই মৃত্তিকারা বক্ষ চিরে তোমাকে দেখলো —
অভ্যন্তরে কী ব্যাকুল তুমি পড়ো ডুয়িনো এলিজি ।
কবরে কী করে লেখো ? মাটি কি কাগজ ? খাতা?
ভালোবেসে উস্কে দিই প্রাণের পিদিম, এই নাও,
অনন্ত নক্ষত্র তুমি অন্ধকারে আমাকে সাজাও
ফের মাতৃগর্ভে, বলো দেবদূত, প্রেমিকা কি মাতা ?
এইসব ঝিঁ ঝিঁ পোকা, এরা যৌবনের, কোন্ পাত্রে রাখি?

পাপে-পুণ্যে এ পৃথিবী, এই প্রাণ তারচে' অধিকে ।
আমি আছি, তুমি নেই—এইভাবে দু'জন দু'দিকে
অপসৃত ; তাই তো নশ্বর নারী কবির বিশ্বাসে,
ভালোবেসে যাকে ছুঁই সেই যায় দীর্ঘ পরবাসে ....।

ব্যবধান

আমার সম্পূর্ণ রক্ত চেয়েছিল
তোমার অর্ধেক ভালোবাসা।
স্বপ্ন কি পৌছেনি এত দূর পরবাসে ?
বেদনা সূচিত ব্যবধানে কোথা সুখ ?
বারবার শত্রু ফিরে আসে ।
একাকী সঙ্গমে শুদ্ধ এই বীর্য,
এই রতিরশ্মি, জানি অর্ধস্ফুট;
কভু সামগ্রিক নয় ।
যৌবনের প্রাপ্য সীমাহীনে
উভয়ে পুড়েছি একা ;
প্রেমহীন আমাদের সত্য-পরিচয়
একদিন লিপিবদ্ধ হবে ।
একদিন অন্তর্হিত হবে ক্ষমা,
তাই সত্য, ভালোবেসে
তুমি যা রচিবে প্রিয়তমা ।

আনন্দ কুসুম

সামনে আমার কবিতার খাতা খোলা
হাতে শুধু এক সীস পেন্সিল কালো
প্রকৃতির লাশ শুভ্র কাফনে মোড়া
বুক ভরা এই রাত্রির আঁধিয়ারে
পেছনে স্মৃতির চঞ্চল মাটি খোঁড়া ।

বুক পেতে দেয়া কাগজের মত প্রিয়
গঙ্গার ধারা নীলকণ্ঠের চুলে
কার নামে আজ কবিতাকে করি শুরু
শব্দের কাঁধে শব্দের শব তুলে ।

লেখা থেমে যায় থামে না একার গতি
শব্দের কাঁদে মাতৃগর্ভে শিশু
পঙ্‌ক্তিবিলাসী কাজ নির্বিকারে

তাকায় কবির অক্ষমতার প্রতি ।

এতেক লিখিয়া বঙ্গদেশীয় কবি
নিজনির্মিত খৈনী পুরিল ঠোঁটে
ভাবের তরল গরলে মিশিয়া যদি
একটি সহজ সরল কবিতা ফোটে
রাত্রির কাছে কাগজের কাছে তবে
অন্তত তার কিছুটা গর্ব রবে ।

কালো রাত্রির প্রতিটি উজান ঠেলে
বুকের পাঁজরে শব্দের দীপ জ্বেলে
এই প্রার্থনা কার কাছে যায় জানি
ইঙ্গিতে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে বলি :
'দয়া চাই দেবী, দয়া কর বীণাপানি ।
তোমার বীণার বাণীর ভরসা পেলে
থামিবে না এই রাত্রির কালোঘোড়া
বেদনাক্ষুব্ধ শব্দের তির্যকে
বীর্যকে আমি অবিনশ্বর জ্ঞানে
তোমারি মুখের আদলে সাজাব ঢেলে ।

এতেক লিখিয়া প্রণাম করিয়া কবি
পুনরায় কিছু খৈনী পুরিল ঠোঁটে
শিলাবৃষ্টির পতনের মতো যেন
পদতলে এসে জীবনের ধারা লোটে
দয়া কর মাগো, দয়া কর বীণাপানি ।

এই ফাঁকে বুঝি বলা প্রয়োজন যে
পাঠক আমার বন্ধু আমার ওরে
তোমাদের মত আমিও জানি না নিজে
কী লাভ এমন রাত্রির কাঁধে চড়ে
এত ভালোবেসে পঙ্‌ক্তি রচনা করা
আকাশের কালো আঁচলে লুকায়ে যবে
ঘুমিয়ে রয়েছে ক্লান্ত বসুন্ধরা ।
কী লাভ তাহলে বেদনার কথা বলে

মানুষ যখন দুখ ভুলিবার ছলে
শিখে গেছে শত ছলনার ছলাকলা।
আমি তবে কেন রাত্রির তাপে গলি ?
আমি তবে কেন অজানা দহনে জ্বলি ?
আমার কথা কি হয় নি তা হলে বলা ?
আমার কথা কি হয় নি তা হলে বলো ?
আমার কথা কি হয় নি তা হলে বলো ?
এই পঞ্চাশ পঙ্‌ক্তির দোলা লেগে
আমার প্রাণের আমার ভিতরে তুমি
প্রাণ ফিরে ফেলে অমৃত মুখ চুমি
না-বলা সকল কথারা উঠিল জেগে
জাগিলই যদি কথারা তা হলে কই
দেয়ালে শুধুই গড়াগড়ি করে ছায়া
জানি মানুষের কবন্ধ নাচে ঐ
মাংসে মিলে না, কংকালে মিলে কায়া
মিলনের মুখে নির্ভার নিষ্কাম
তবু মানুষের ক্ষণ-জীবনের মায়া
কখনো কমে নি বরং বেড়েছে আরো
মিলন মানে যে মৃত্যুকে ছোঁয় তারো
উদ্বাহু নেশা নৃত্যে নূপুরে বাঁধি
ছুটে যায় ছুঁতে ; আমি শুধু অপরাধী
আপনার কাঁধে অপরের বোঝা বয়ে
পদতলে একা মরে যাই অবক্ষয়ে ।
কোথায় আমার কথারা তা হলে কই
ঐ মানুষের কবন্ধ নাচে ঐ।
আমার দুঃখ আমি কিছুটা বুঝি
কেউ যদি তার বেদনার দায়ভাগে
ভিখারির দাবি শোধ করে থাকে আগে
ইঙ্গিতে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে আমি
আরো আগামীর বেদনার ভাষা খুঁজি ।
এই ফাঁকে বুঝি বলে রাখা দরকার
তিন রাত্রির নিদ্রাবিহীন চোখ
শরীরের মাঝে অশরীরী চরকার
রোমন্থনের ইঙ্গিতে নির্মোক

হয়ে গেল যেন জীবনের আয়োজনে
লভিল জীবন ক্ষণ-মৃত্যুর স্বাদ,
আধো নির্মিত কবিতার শবখানি
প্রতিনিধি হয়ে জাগিয়া রহিল পাশে
তোমার ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ
করে থাকি যদি অজানা সর্বনাশে
ক্ষমা কর দেবী, ক্ষমা কর বীণাপানি ।
এতেক লিখিয়া গত রাত্রির কবি
নব প্রভাতের খৈনী পুরিল ঠোঁটে
বন্ধনহীন গঙ্গার মতো যেন
তোমার নামের ভাবের লহরী ছোটে,
দয়া করে মাগো দাও তব বীণাখানি ।

* * * * *

ফুলে ফুলে ভুলে ভুলে মনে মনে কতবার
উড়ে উড়ে সুরে সুরে গাঁথি কত মনিহার
হুলে হুলে কীটে কীটে ফুলকলি কত ফোটে
আমি কত দুখ পাই কে সে খোঁজ রাখ তার ?

পাখি সনে বনে বনে গাহি কত গুণগান
তারে তারে বারে বারে তুলি কত মধুতান
তরুবায় নদী নায় চারু হাত ভিখ্ চায়
বীণাপানি যদি তায় বীণাখানি রেখে যান।
যদি ঘুমঘোর টুটে মুখখানি দেখি মা'র !

* * * * * *

এর মাঝে যদি থাকে সঙ্গীতধারা
জানি তা ধুলায় কখনো হবে না হারা
তুমি শুধু দেবে নতুন মাধুরী তাতে
আর কিছু নয় নবজীবনের প্রাতে
তোমার গানের বীণাখানি লয়ে হাতে
তোমারি দ্বারের প্রহরী সাজিব আমি
মেঘমল্লারে টংকার তুলি রাতে
ডাকিয়া আনিব তোমার আকাশ স্বামী ।

তোমরা মিলিবে নিভৃতে নিরালায়
বীর্যে বজ্রে বিহ্বল বিদ্যুতে
আমি হবো সেই মিলনের মালাকার
পাত্র-উচ্ছল বীর্যের দাগ ধুতে
লুকাব আমার প্রকৃতির পরিচয়।
আমি জানি সেই মিলনের উৎসবে
তোমাতে আবার আমারি জন্ম হবে ।
এতেক রচিয়া কবি হঠাৎ খেয়ালে
তাকিয়ে দেখেন বন্দী ঘরের দেয়ালে
মাতৃরূপে মাকড়সা করিছে শ্রবণ
পুত্রের রচিত কাব্যে শব্দ প্রস্রবণ ।

ইঙ্গিতে কাড়িয়া দৃষ্টি হঠাৎ হাসিতে
দেখালেন শুক্র এক ভাসিতে ভাসিতে
কীভাবে পলির চরে জড়ের জরায়ু
খুঁজে পেল মধ্যরাতে সেই দৃশ্যটুকু।
—প্রজন্ম প্রবৃত্ত চিত্তে আরোহীর আয়ু
মাতার মাতাল বৃত্তে প্রাণ ঢালি পিতা
সঙ্গম সম্পৃক্ত নৃত্যে আনন্দ সংহিতা
রচনা করেন রক্তে অজড় অক্ষরে
সন্তান জন্মের মাটি জননী বক্ষরে
সাজিয়ে অমৃতে বিষে দুধে আর্দ্র স্তন
নাভি যোগে করে পান আপন সৃজন
অভ্যন্তরে আম্রমাঝে আঁটির মতন ।

মহাশূন্যে অন্ধকারে ঝড়ের ঝাপটে
দারুণ খরায় রৌদ্রে দিনের দাপটে
কেঁপে কেঁপে ওঠে মজ্জা শীতের শিশিরে
শৈত্যের প্রবাহ তোলে সুখ আত্মহারা
জননীর আত্মগর্ব প্রকাশের ধারা
অব্যাহত গতি প্রায় সন্তানের হাতে
প্রবাসী পিতার কথা সেইসব রাতে
মনেও পড়ে না, শুধু মাতৃ-কোমলতা
সর্বাঙ্গ বাঁধিয়া রাখে বন্দী সোমলতা ।

চিত্রিত চিকুর জালে বাহিরের আলো
যদি বা ছড়ায় তার কোনো বিচ্ছুরণ
প্রবেশ করে না মূলে আমি যতক্ষণ
আমার মিলন পরিপূর্ণ বিস্ফোরণে
সাঙ্গ করি প্রপাতের প্রথম পাথরে

ক্রমে ক্রমে বাড়ে দেহ, স্পর্শকাতরতা
কোমলে কর্কশে যুঝে মণির ম্লানতা
জড়ায় চর্মের ভাঁজে শৈবালের মতো
অন্তর বাহির দ্বন্দ্বে চিরযুদ্ধ রত
মানুষ জাগ্রত হয় কামে ক্রোধে লোভে
মদে মোহে মাৎসর্যে, ইন্দ্রিয়-বিক্ষোভে ।
পদাঘাতে দীর্ণ করি জলজ কুসুম
বাহিরে বাড়ায় মুখ কালের কাছিম ।
ননীর মতন নগ্ন শ্যামতনু দিয়ে,
জটিল অস্ত্রের বন্ধ ছিঁড়ে ফেলে শিশু
সাঙ্গ করে জীবনের প্রথম বিপ্লব ।

এতেক লিখিয়া নব জন্মের লাগি
থামিল আমার সচল কলমখানি ।
দরোজায় শুনি কড়া নাড়িবার ধ্বনি,
ছুটে গিয়ে দেখি কিছু নাই, কেহ নাই
দরোজায় জ্বলে দরোজার রোশনাই ।
রথযাত্রার সিঁদুর গোলার মতো
কলতলে শুধু মৃতের রক্ত ঝরে ।
কলতলে শুধু মৃতের রক্ত. ঝরে ।
কলতলে শুধু মৃতের রক্ত ঝরে।
মুরগী না ওরা মানুষ করেছে খুন,
অতিথি আমার অতিথি আমার ওরে !

দিন ভরে তুলি রাত্রির দিকে চেয়ে
মানুষের মন দখল করেছে ঘড়ি,
সন্ধ্যা আমার রাত্রিকে ভোর করি ।

নিশীথিনী চাঁদ ভোরের সূর্যে জ্বলে
দিনের সূর্য রাত্রির বুকে গলে
লুটায় যেমন অন্ধ আকর্ষণে
কবির গর্ব কবিতার পদতলে ।

এইভাবে গত একদিন একরাতে
অক্ষমতার অবিবেকী করাঘাতে
ক্ষমতা দিয়েছে মূঢ়তার পরিচয়
মানুষকে তবু পৃথক রেখেছি আমি
অনাগত দূর আগামীর বিশ্বাসে
করেছি আপন মাধুরীতে দুর্জয় ।

এতেক লিখিয়া করতলে মাথা চুনে
তাকালো রাতের ব্যাঘ্র শিকারী কবি
প্রয়োজনেবোধে ভারী শব্দের তূণে :
উদাসীনতার অভিযোগ তুলে যারা
বিজয়ানন্দে আপনি আত্মহারা
কবিতাকে হানে দণ্ডিত আক্রোশ,
তাদের মুখোশ খুলে দিতে এস কবি
মুখোমুখি আনি শব্দের সন্ত্রাস ।
আমি চিনে গেছি প্রগতির ছলে কারা
মানুষের নামে শিল্পকে করে তাড়া
ক্ষমতার সাথে গোপনে গিয়েছে ভিড়ে
ছত্রভঙ্গ জনতার মীড়ে মীড়ে
ভস্ম যখন স্বপ্নের প্রিয় ছবি
তখন মূর্খ তাত্ত্বিক পলাতক ।
বুকের পাঁজরে জাতির স্বপ্ন নিয়ে
অস্ত্রের মুখে কে তখন নির্ভয় ?
দুর্বল ভীরু সেই উদাসীন কবি ।

মূর্খকে তবু মূর্খ বলাটা জানি
প্রকৃতই কোনো কবির স্বভাব নয়
বর দাও নির্ভুল পরিচয় ।

দংশন শেষে ক্লান্ত সর্পফণা
ফিরিল আপন অবনত ইচ্ছায়,
গতরাত্রির মৃত মাধুরীর কণা
চঞ্চুতে গিয়ে প্রজাপতি এল ঘরে
পরান আমার বন্ধু আমার ওরে
বধূ বরণের ব্যাকুল চিত্ত নিয়ে
শতাব্দী ধরে বসে আছি মোর প্রিয়ে
একখানি ছাদ চারটি দেয়ালে ধরে ।
বল্ দেখি তোর কোনটাতে মন চায় ?
এইখানে আসি শব্দের মরদেহ
নগ্ন মাটির সমুখে ঈশের মত
ক্লান্ত শিথিল সারাদিন ছিল থেমে
দু'দু'টি বাহুর রাহুর আকর্ষণে
দু'দু'টি ঊরুর উর্বশী ইশারায়
মন্ত্রমুগ্ধ মানবিক চাষা এল
ঈশখানি নিয়ে মাটির ভিতরে নেমে
যেন বা তাহারে জাগায়ে তুলিল কেহ
ক্ষতশৃঙ্গারে নবরাত্রির প্রেমে ।

কবিতা আমার এইখানে এসে দেখি
অতিমাত্রায় হয়ে গেছে শারীরিক
শব্দ আমার শত্রু আমার এ-কী,
মাংস আমার মজ্জা তোমার ধিক্ ।

বীর্যেরা তোর সর্প বিষের মতো
নারীর ভিতরে তাকে না মানায় বোকা
তুই হবি তোর আত্মার উপগত
মানুষের মতো তুই হবি তোর পোকা ।

শব্দে ছন্দে রঙের তুলিতে তুই
আঁকিবি শুধুই পরমিলনের ছবি
নিজেকে ভাঙিয়া সৃজন করিবি দুই
মিলন চাহিয়া বিরহের মাঝে রবি ।

এই হলো তোর নিয়তির অভিলাষ,
তোর বুকে এক অশরীরী চিতা জ্বলে
প্রত্যহ তার বেদনার কথা বলে
উজ্জয়িনীর পাহাড় ছাড়িয়া দূরে
যেতে হবে তাকে ভালবাসিবার ছলে
হে কবি আমার ভাগ্য আমার ওরে—
কবিতা এমনি করুণ দীর্ঘশ্বাস ।

মাত্র ষোড়শ পঙ্‌ক্তির বাণী দিয়ে
সেই প্রজাপতি পাখনার রেণু ঝেড়ে
দাঁড়ালেন প্রিয় বীণাখানি হাতে নিয়ে
দেয়ালে তাহার পড়িল না কোনো ছায়া
আঁধারে কেবলি একখানি রেণু ভেসে
উড়িতে উড়িতে, বেড়াতে বেড়াতে এসে
বসিল আমার কপালের ঘাম ছুঁয়ে।

ভাগ্য আমার ভাগ্য আমার আহা,
চক্ষু মুদিয়া কেন যে তখন তাঁকে
মাথা নত করি প্রণাম করিনু নুয়ে ।
শূন্য দেয়ালে কিচ্ছুটি লেগে নেই
এমন কি নেই ছলনারো কোনো দাগ
হায়রে আমার রাত্রি কী নির্দয় !

* * * * *

তুমি যদি এইভাবে সুপ্তিমাখা লাজে
অনভিজ্ঞ হৃদয়ের মাঝে ঠেলে দাও
চিরায়ত মুখ, আহত উন্মুখ আমি
সহিতে পারি না সখা, সহিতে পারি না

তোমারে গ্রহণ করি প্রাণের প্রসারে
এত গর্বে উপাচারে যদি বারবার
তুমি এসে ভরে তোলো পৃথিবী আমার
এত ভালোবাসা আমি সহিব কেমনে ?

বাঁশিতে ভৈরবী বাজে সে-ও বুঝি চেনে
বাঁশির অদৃশ্য বীণাখানি, হে মোহিনী,
তোমারি মূরতি তবে এত ভাঙা কেন
এত জনে এত মনে এভাবে ছাড়ান
কী করে চিনিব তাঁকে ? তোমার ছলনা,
বল না সহিব আমি, — সহিব কেমনে ?

* * * * *

এতেক রচিয়া চক্ষু মুছিয়া কবি
তাকালেন ফিরে পারদের আরশিতে
ওপারে তখন মুখোমুখি একজন
হঠাৎ হাসিতে উন্মাদ করে দিয়ে
রক্ত ঝরাল টকটকে আলজিভে ।

* * * * *

হয়তো দূরে কেউ কল্পনার বলে
শুক্র সমাধির স্বপ্ন দেখেছিল
মোহন যামিনীর মেদুর মেঘনীড়ে
গোপন অভিসারে চরণ রেখেছিল ।

হয়তো ছিল তার আমারি মত কিছু
পূর্ণ মিলনের পথের পিছুটান
স্বামীর সোহাগের বিবেকী দংশনে
যন্ত্রণার ক্ষতে জাগর অভিমান । .

হয়তো আজো তার চুমিত হাতখানি
গোপন অভ্যাসে জানালা খুলে দেয়
হয়তো আজো তার চপল পদযুগ
চলিতে পথে পথে না-চলা শিখে নেয়

যখন ক্লান্তির করুণা বুকে নিয়ে
চাঁদের বোঝা বুকে আকাশ ঢল ঢল
তখন নিদ্রার প্রাত্যহিকতায়
কোমল কামনার বিছানা পাতা হল ।

রাতের কালো ঘোড়া পরিল লাল টিপ
কপালে সিঁদুরের মালিনী জ্বলজ্বল
বক্ষ বন্ধনী পরিয়া অলকার
আম্রপালি এসে দাঁড়াল দরজায় ।
তবে কি অবসিত রাতের জঙ্ঘায়
নারীর শয্যায় পুরুষ পরাজিত ?

* * * * *

শুভ্র মণিজাল মগজ মন্থনে জাগিল ফেনসম মদিরে ;
আপন উরুযুগে ঝরিল পয়োধারা, আহা কী অমৃত অপচয়
ক্লান্ত কটিতটে ক্ষিপ্র কালো ঘোড়া লুকাল মুখ তার কেশরে
হ্রস্ব হতে হতে দীর্ঘ ছায়াখানি যেন বা পদতলে অবনত ।

* * * * *

এতেক ভনিয়া সমর শাসিত কবি
সুমতিহারের খৈনী পুরিয়া ঠোঁটে
দৃষ্টি ফেরাল আকাশের সেরা চাঁদে ।
তোমার অমর যাদুমন্ত্রের বলে
আকাশটা জানি আটকাতে পারি ফাঁদে ঃ
গতকালকের চাঁদখানি দেখি আজও
মহাশূন্যের ভিতরে গেড়েছে খুঁটি
কতকাল পরে গতকাল যেন এল
মহাকাল থেকে আজকাল পেল ছুটি ।

মুখখানি তার মেঘের শিফনে ঢাকা
অঙ্গে তাহার উজ্জ্বল বেনারসী
বুঁটি কাজ করা রেশমের নীলে জ্বলে
তারাগুলি তার খোঁপায় বকুলগুলি ?
আধুনিক কবি সহ্য করে না এত
উত্তেজনায় টেনে নিতে চায় কাছে
আমি বসে ভাবি প্রাচীন কবির মতো
আমার এখনও অনেক সময় আছে ।

যারা বলে তুমি সূর্য বীর্যে ঋণী
দুঃখ আমার আমি উহাদের চিনি

আমি জানি তুমি আমার বীর্যে বাঁচ
আমার জানালা উজ্জ্বল করে নাচ ।
বৈজ্ঞানিকের কথা শুনে হাসি পায়
যার ইঙ্গিতে ভালোবাসা ছুটে যায়
সেই চাঁদ বুঝি পৃথিবীর চেয়ে ছোটো ?
আমি জানি তুমি কত বড় প্রিয়তমা
করজোড়ে বলি মূর্খেরে করি ক্ষমা
তুমি যেন আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠো ।
মানুষের ছোটো আছে নাকি দুনিয়ায় ?

* * * * *

আমি তো আর সব চাই নি অবকাশের খেলার সঙ্গী
চেয়েছিলাম পুরুষাঙ্গে কর্মরতা নারীর ভঙ্গি ।
পাথর কাটা নিতম্বেতে একটুখানি চর্বিঝোলা
দুর্বিনীত মেদুল নাভি পরশে হোক আত্মভোলা ।
আনন্দিত বক্ষটিতে এই যে এত কঠিন দিলে
আমার শিশু জন্ম নিলে কার বুকে সে পীযূষ খাবে ?

নারীর বিপরীতে পুরুষ সম্মিলনে তৃপ্ত হত
বৈপরীত্যে কবিকে তাই সাজিয়েছিলে ইচ্ছে মত ।
নিজের বুকে বুক মিশিয়ে আপনাকে যে সবটা গেলে
আমার ফেলে সেই আমিটা অপরে বুঝি তৃপ্তি পাবে ?

* * * * *

এই তো আমি খুলে দিলাম বস্ত্র বাঁধন যত
হ্রেষা আমার উত্তেজিত কালো ঘোড়ার মত
লাফিয়ে উঠে মধ্যরাতে আকাশটাকে ছুঁল
ভালোবাসার স্বচ্ছজলে উৎসটাকে ধুল ।

এই তো আমি খুলে দিলাম চর্ম ঢাকা তনু
বীর্য আমার লক্ষ্যভেদী তীর সাজাল ধনু ।
দুই উরুতে বন্দী ঘোড়া লুকাল লাল মুখ
বরাহ কর্দমে যেমন রমণে উন্মুখ ।
এই তো আমি খুলে দিলাম রক্তমাখা রতি
গ্রহণ কর বীণাপানির জননী পার্বতী ।
এই তো আমি খুলে দিলাম অস্থি ঢাকা প্রাণ

গ্রহণ কর মজ্জা আমার অমৃত সন্তান
আর কত সে নগ্ন হবে প্রভু
নগ্নতা কি কখনো সম্ভব ?

* * * * *

পূর্ণ নগ্নতা কভু কি সম্ভব পাথরেও ?
যে মেঘ সরে গিয়ে চাঁদকে করে যায় বস্ত্রহীনা
সে চাঁদ মুখ থেকে হঠাৎ ঝরে যদি পূর্ণিমা - ;
আঁধার পড়ে থাকে, কে জানে সে আঁধার নগ্ন কিনা ?

* * * * *

এইখানে আসি অমৃতরাশি লয়ে
মৃত্যু আমারে ডাকিলেন ইঙ্গিতে
কে যেন তখন মানুষের মত ভয়ে
অভ্যাসে দুই চরণ ধরিল টানি
'না' 'না' চিৎকার ভরিল গগণখানি ।
আরও কিছুকাল ভিক্ষা মাগিল প্রাণ
ভগবান নয়, আপন প্রাণের কাছে ।

পরম আদরে শিশুকে অভয় দিয়ে
মৃত্যু তখন আমারি স্বরূপ নিয়ে
আমাকে নিলেন কালকুর থেকে তুলে
মন-পবনের পালতোলা ডিঙ্গিতে ।

পেছনে রহিল কংশের বুক ভরি
অশ্রু আমার মগরা সোমেশ্বরী ।
পেছনে রহিল হাঁটুজলে বিষ্ণাই
গত জনমের কত শত তৃষ্ণাই ।
পেছনে রহিল জন্মের বন্ধনে
ছায়াটি আমার কৃতার্থ কাশবনে ।

একখানি চাবি একটি শীতল পাটি
আর জননীর শ্মশানের আঙরাটি
রাখিয়া আমার নতুন মায়ের হাতে
পিতার চরণে প্রণাম করিয়া রাতে
আমি চলিলাম দূর ভুবনের টানে

অজানা অন্ধ আনন্দ সন্ধানে ।

পেছনে রহিল ভিক্ষাপাত্র পাতা
স্বদেশ আমার জননী আমার ওরে
সত্য আমার শেষ কবিতার খাতা ।

পেছনে রহিল বন্ধুর মৃত মুখ
পেছনে রহিল শত্রুর মৃত মুখ
লজ্জা জড়িত অপমান ইতিহাসে
আমি চলিলাম পরাজিত বিশ্বাসে
প্রাচীনতা ঘেরা সেই প্রকৃতির তীরে
আশ্রয় মাগি পাখিরা যেখানে ভিড়ে ।

আমি চলিলাম আকাশ নদীতে ভাসি
চন্দ্র আমার গত সূর্যের হাসি
মৃত্যু আমার ডিঙ্গির কালো মাঝি ;
স্বপ্ন আমার পূর্ণ হইল আজি
নতুন পুষ্পে গত পুষ্পের সাজি ।

তিনভুবনের ভার

অপরের ঘরে এ জীবন কাটে যার
তুমি তুলে দিলে তার হাতে এই
তিন ভুবনের ভার ।

আমি জানি এই বিরূপ বিশ্বটিতে
আমি কতখানি অযোগ্য অধিবাসী ।
তাই চাহি নাই এতটুকু ঠাঁই নিতে ;
তুমি লিখে দিলে কী করে এড়াই
তিন ভুবনের ফাঁসি ?

আমি ছিনু বাসী কলাবতী ফুলে
মধু আহরণে মগ্ন ।

বাগানের মালী, ফুলে জল ঢালি
আর গুটিকয় প্রজাপতি পালি
ডানাহীন বিষে নগ্ন ।

কীটের অধিক কীটসম যার
কাদার ভিতরে বাস, অগোচরে বুঝি
ঝরেছিল তার একটি দীর্ঘশ্বাস ।
বিস্তৃততর ভুবনের তরে কভু ।

সেই হল কাল, প্রভু
কীটের কণ্ঠে পরালেন নিজ হার
এবং দিলেন শুক্র-শনি-রবি,
এই তিন ভুবনের ভার ।

শুক্র-শুভ্র তনুখানি যদি দিলে
শনি কেন তবে অভ্রের জিহ্বায়
আত্মদ্বৈত প্রেমিকের সাথে মিলে
রবি-রশ্মির চক্রটি চেটে খায় ?

শাখামৃগে যদি মুক্তার মালা দিলে
রাজ রক্তের দম্ভটি কেন নেই?
কাল কেন সেই মুক্তার দ্যুতি গিলে,
জন্মকে কেন মৃত্যুতে ছেড়ে দেই ?

আমি তো চাহি নি জয়ের বাসনা নিতে
তুমিই পাঠালে বিজয়ের পৃথিবীতে,
তবে কেন এই ছিন্ন পাদুকা আসি
লুটায় বিজয় মুকুটের পাশাপাশি ?

বঞ্চিত করে মেরুদণ্ডের হাড়,
দিয়েছিলে তবে স্কন্ধে আমার
তিন ভুবনের ভার ?

যাত্রা-ভঙ্গ

হাত বাড়িয়ে ছুঁই না তোকে
মন বাড়িয়ে ছুঁই,
দুইকে আমি এক করি না
এককে করি দুই ।

হেমের মাঝে শুই না যবে
প্রেমের মাঝে শুই
তুই কেমন করে যাবি ?
পা বাড়ালেই পায়ের ছায়া,
আমাকেই তুই পাবি ।

তবুও তুই বলিস যদি যাই,
দেখবি তোর সমুখে পথ নাই

তখন আমি একটু ছোঁব
হাত বাড়িয়ে জড়াব তোর
বিদায় দু'টি পায়ে,
তুই উঠবি আমার নায়ে
আমার বৈতরণী নায়ে।
নায়ের মাঝে বসব বটে,
না-এর মাঝে শোব ;
হাত দিয়ে তো ছোঁব না মুখ
দুঃখ দিয়ে ছোঁব ।
তুই কেমন করে যাবি ?

কসাই

একদিন এক বিজ্ঞ কসাই
ডেকে বললো : 'এই যে মশাই,
বলুন দেখি, পাঁঠা কেন হিন্দুরা খায়,
গরু কেন মুসলিমে ?'

আমি বললাম : 'সে অনেক কথা,
ফ্রেশ করে তা লিখতে হবে
কর্ণফুলীর এক রীমে ।'

কসাই শুনে মুচকি হাসে :
'বেশ বলেছেন খাঁটি,
আমি কিন্তু একই ছোরায়
এই দু'টোকেই কাটি ।'

দণ্ডকারণ্য

আজ প্রায় ত্রিশ বছর পর রেখার চিঠি পেয়ে আমি তো অবাক ।
পাছে চিনতে ভুল করি, তাই নিজের পরিচয় দিয়েই রেখা
শুরু করেছে তার চিঠি :

'আমি রেখা। জানি, আমাকে চিনতে তোমার কষ্ট হবারই কথা।
সে তো আজকের কথা নয়, সে যে হলো কতো কাল !
আমি ছিলাম তোমার ছোটোবেলার খেলার সাথী
এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে আজ পুনর্বার অনুভব করলুম,
লজ্জা নামক মেয়েলি বোধটা একেবারে উবে যায় নি তোমার এই
পোড়ামুখী বোনটার রক্ত থেকে । পাছে পোড়-খাওয়া এই বুকে
প্রেম নিবেদনের তৃষ্ণা জেগে ওঠে, তাই শুরুতেই বলি, তুমি কবি
হয়েছো বলেই আমাদের রক্তের সম্পর্ক যায় নি ছোটো হয়ে ।
আমি বকুল মাসির মেয়ে যে, এবার মনে পড়লো ?''

'তুমি কবি হয়েছো, জানলাম এবং পড়লাম তোমার কবিতা কিছু ।
পড়তে পড়তে বুকের ভিতরে হা হা করে উঠলো হাজার তারের বীণা,

আহা, ভালোবাসা দূরের কথা ; একটু ঘৃণাও বুঝি থাকতে নেই
আমাদের জন্যে ? না, আমার বিয়ে হয় নি ।
দণ্ডকারণ্য থেকে মানা, আর মানা থেকে দণ্ডকারণ্যে ছুটতে ছুটতে
ফুটতে পারে নি বিয়ের ফুল আমার, কিন্তু তার পাপড়ি গেছে ঝরে ।
কংস পাড়ের এই বঙ্গ-দুহিতার বুকে বসেছে মৌমাছিদের মেলা,
তাতে মিটেছে ভারতের লাম্পট্যের তৃষ্ণা -,
কিন্তু আমার ঘর জোটে নি ভাই। এখন আর স্বপ্ন দেখি না ।
কখনো কখনো দুঃস্বপ্নের ঘোরে যে ভাষায় কথা বলে উঠি,
তাতে বৃদ্ধ পিতার চোখ আর্দ্র হয় বটে, কিন্তু হিন্দিতে অনুবাদ
না করে দিলে শ্রীমোরারজী দেশাই তা বুঝতেও পারেন না ।
কিন্তু তোমার তো বোঝার কথা, ভাষা কি বদলে গেছে খুব ?
দুঃখ কি এতই দেশজ ? এতই কি নিষ্ঠুর রাজনীতি ?
এতই কি প্রবল জীবন আর মৃত্যুর ব্যবধানও ?

ফিরতে চেয়েছিলাম জ্যোতিবাবুর রাজত্বে, কোলকাতায়,
ছোটোমামা মৃত্যু-শয্যায়, তাঁকে দেখবো, কিন্তু ফেরা হয় নি আমার ।
আরো কয়েক হাজার পদ্মা-মেঘনা-যমুনা পাড়ের রেখার মতোই
আমাকে নামিয়ে দেয়া হলো খড়গপুর রেল ষ্টেশনের চির-অন্ধকারে ।
জ্যোতিবাবু গেছেন শ্রীদেশাই-এর সঙ্গে আলাপ করতে ;
আমি এক শিখরে গাড়িতে চড়ে বসেছি । না, আমার বিয়ে হবে না ।
ভারতবর্ষের দ্রুতগতিসম্পন্ন এই ট্রেনগুলি আমাদের জন্য নয় ।
তোমাকে এসব কথা লিখে লাভ নেই জানি, ভারতের মতো বিশাল
দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তুমি হস্তক্ষেপ করবে কোন্ সাহসে?

কিন্তু তুমি তো কবি, না-ই বা হলে আমার ভাই তুমি, তাইবলে
তোমার কবিতা থেকে আমারাই বা বঞ্চিত হবো কোন্ অপরাধে ?

না হয় তোমার ছোটোবেলার রেখাকে নিয়েই লিখো একটি
যেমন তেমন প্রেমের কবিতা ; আজকের হাজার রেখার অশ্রু
না হয় না-ই মোছালে তুমি !'

কাল সে আসিবে

আর কিছু নয়, রাজ্য চাই না,
চাই না তিলক, চাই না তালুক ;
চাই শুধু মন-মানুষে মিলুক
কবিতা আমার । — সেই বিশ্বাসে
যারা কাছে আসে, তাহাদের নিয়ে
একা পথ চলি, আর মাঝে মাঝে
অপমানিতের হয়ে কথা বলি।

বাঁশি যে বাজায় সে তো কংকাল,
প্রাণের ভিতরে আপনি সে গায় ;
আপনার মাঝে নিজেকে সাজায় ।
শোনাতে চায় না, তবু যারা শোনে,
চারপাশে যারা শ্রম ঘামে বুনে
পৃথিবী সাজায়, তাদের পারি না
উপেক্ষা করে পায়ে দলে পিষে
নির্মল বিষে নিমগ্ন হতে ।

এই গ্রন্থটি লেখা হয়ে যাক,
গান শোনে যারা তারা কিছু পা'ক
আমার জন্য অশেষ নাথাক
রেশটা তো রবে, তাই দিয়ে হবে
তোমার অর্ঘ্য, তোমার উত্তরীয় ।

ঘৃণা করে যারা তারা পিছু যায়,
ভালোবাসে যারা তারা কিছু পায়।
এই স্বাভাবিক, আমি তবু ঠিক
কুলকুল রবে যে নদী হারায়;
তার স্তবগানে হই না মুখর ।
খর-বৈশাখে আমি আনি ঝড়,
আমি ভালোবাসি সাহসের স্বর ।
প্রতিঘাতময় মুখর জীবন
সোনামুখী সুচে শিল্প সীবন ।

আর কিছু নয়, আমার গগণ—
-তৃষী বাসনা মেলিয়াছে ডানা
গানের ভিতরে, আর ভাষা চাই।
আশা দিয়ে রোজ যে মুখ সাজাই
তার কাছে পাই যেটুকু শান্তি
ক্রুর কাল এসে তার সে শ্রান্তি
ধুয়ে মুছে দেয়, চিহ্ন রাখে না ।

এই ভেবে কত প্রেম ফেলে দিই
আপন ভাবিয়া বুকে তুলে নিই
অপরের ব্যথা, কত ব্যর্থতা
পায়ে দলে চলি সমুখের ডাকে ;
গতিচঞ্চল জীবনের বাঁকে
তবু বহু ভুল থেকে যায় জানি ।

সতর্ক চিতে যত যতি টানি,
মানুষের লাগি যত গীত ভানি
কাল সে আসিবে, মুখখানি তার
যতই দেখিব ভালবাসিবার
বাসনা জাগিবে চিতে, আসিবে না
জানি, কাল চিরকালে ধরা দিতে ।

আগামী কালের সতনু শিখাটি
পোড়াবে আমার শ্রেষ্ঠ লিখাটি।
তবু কথা লিখি, তবু গান গাই,
মনের ভিতরে, যে মানুষ চাই
তার কিছু পাই গূঢ় চেতনায়
অন্ধ প্রাণের বন্ধ বন্দী কূপে ;
কিছু রেখে যাই ব্যর্থ-শিল্পরূপে ।

সেই রাত্রির কল্পকাহিনী

তোমার ছেলেরা মরে গেছে প্রতিরোধের প্রথম পর্যায়ে,
তারপর গেছে তোমার পুত্রবধূদের হাতের মেহেদী রঙ,
তারপর গেছেন জন্মসহোদর, ভাই শেখ নাসের,
তারপর গেছেন তোমার প্রিয়তমা বাল্যবিবাহিতা পত্নী,
আমাদের নির্যাতিতা মা।

এরই ফাঁকে একসময় ঝরে গেছে তোমার বাড়ির
সেই গরবিনী কাজের মেয়েটি, বকুল।
এরই ফাঁকে একসময় প্রতিবাদে দেয়াল থেকে
খসে পড়েছে রবীন্দ্রনাথের দরবেশ মার্কা ছবি।
এরই ফাঁকে একসময় সংবিধানের পাতা থেকে
মুছে গেছে দু'টি স্তম্ভ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র।
এরই ফাঁকে একসময় তোমার গৃহের প্রহরীদের মধ্যে
মরেছে দু'জন প্রতিবাদী, কর্নেল জামিল ও নাম না-জানা
এক তরুণ, যাঁরা জীবনের বিনিময়ে তোমাকে বাঁচাতে চেয়েছিল।

তুমি কামান আর মৃত্যুর গর্জনে উঠে বসেছো বিছানায়,
তোমার সেই কালো ফ্রেমের চশমা পরেছো চোখে,
লুঙ্গির উপর সাদা ফিনফিনে ৭ই মার্চের পাঞ্জাবি,
মুখে কালো পাইপ, তারপর হেঁটে গেছো বিভিন্ন কোঠায়।
সারি সারি মৃতদেহগুলি তোমার কি তখন খুব অচেনা ঠেকেছিল?
তোমার রাসেল? তোমার প্রিয়তমা পত্নীর সেই গুলিবিদ্ধ গ্রীবা?
তোমার মেহেদীমাখা পুত্রবধূদের মুজিবাশ্রিত করতল?
রবীন্দ্রনাথের ভুলুণ্ঠিত ছবি?
তোমার সোনার বাংলা?

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামবার আগে তুমি শেষবারের মতো
পাপস্পর্শহীন সংবিধানের পাতা উল্টিয়েছো,
বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে এক মুঠো মাটি তুলে নিয়ে
মেখেছো কপালে, ঐ তো তোমার কপালে আমাদের হয়ে
পৃথিবীর দেয়া মাটির ফোঁটার শেষ-তিলক, হায়!
তোমার পা একবারও টলে উঠলো না, চোখ কাঁপলো না।

. . .

তোমার বুক প্রসারিত হলো অভ্যুত্থানের গুলির অপচয়
বন্ধ করতে, কেননা তুমি তো জানো, এক-একটি গুলির মূল্য
একজন কৃষকের এক বেলার অন্নের চেয়ে বেশী ।
কেন না তুমি তো জানো, এক-একটি গুলির মূল্য একজন
শ্রমিকের এক বেলার সিনেমা দেখার আনন্দের চেয়ে বেশী ।
মূল্যহীন শুধু তোমার জীবন, শুধু তোমার জীবন, পিতা।

তুমি হাত উঁচু করে দাঁড়ালে, বুক প্রসারিত করে কী আশ্চর্য
আহ্বান জানালে আমাদের । আর আমরা তখন ?
আমরা তখন রুটিন মাফিক ট্রিগার টিপলাম ।
তোমার বক্ষ বিদীর্ণ করে হাজার পাখির ঝাঁক
পাখা মেলে উড়ে গেলো বেহেশতের দিকে ......।
.....তারপর ডেড্‌স্টপ।

তোমার নিস্প্রাণ দেহখানি সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে, গড়াতে, গড়াতে
আমাদের পায়ের তলায় এসে হুমড়ি খেয়ে থামলো ।
—কিন্তু তোমার রক্তস্রোত থামলো না ।
সিঁড়ি ডিঙিয়ে, বারান্দার মেঝে গড়িয়ে সেই রক্ত,
সেই লাল টক্‌টকে রক্ত বাংলার দুর্বা ছোঁয়ার আগেই
আমাদের কর্ণেল সৈন্যদের ফিরে যাবার বাঁশি বাজালেন ।

কংসের সাথে সমুদ্রের বেশ মিল আছে

একবার এসেই দেখুন কংস নদের সাথে সমুদ্রের বেশ মিল আছে ।
হাসবেন না, দোহাই, আমাদের গাঁয়ের লোকেরা খুব কষ্ট পাবে ।
একবার এসেই দেখুন নিজ চোখে, কংস কোনো যা তা নদী নয়,
রীতিমত বেগবান, বেশ চওড়া-সওড়া। না, এর জল সাধারণ
নদীর মতন এতো মিঠা নয়, একটু লবণ লবণ ভাব আছে।

দুর্গা বিসর্জনে গিয়ে এর লবণ জলের স্বাদে আমি আঁতকে উঠেছি ।
আরে, এ-তো শুধু নদী নয়, এ-যে সমুদ্রের ছদ্মবেশী রূপ।
কোনোদিন কাউকে বলি নি। শুধু সুদূর শৈশব থেকে মনে মনে
মিলিয়েছি বারহাট্টার কক্সবাজার, কংসের সাথে বঙ্গোপসাগর
কক্সবাজারের মতো এমন বিস্তৃত বেলাভূমি হয়তো এখানে নেই,

হয়তো এখানে নেই পর্যটন বিভাগের উপর প্রবাল, কিংবা কংসের
মুখোমুখি সাজানো কটেজ। কিন্তু হতে কতক্ষণ?

একবার এসেই দেখুন, কংস স্রেফ প্রথাসিদ্ধ শান্ত নদী নয়,
এখানে গর্জন আছে, শোঁ-শোঁ শব্দে হাওয়া ছোটে রাতে,
ঢেউ এসে সজোরে আছড়ে পড়ে তীরের নৌকোয়।
সমুদ্দুরে কী এমন বেশী? নুড়ি? আমরা না হয় কিছু
সামুদ্রিক নুড়ি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখে দেবো।

আপনারা জানতেও পাবেন না, যেমন পাই নি আমি।
প্রসাধিত সমুদ্রের কাছে গিয়ে বারবার অবাক বিস্ময়ে শুধু
বলেছি নিজের মনে মনে : 'কারা এতো রেখে গেলো নুড়ি?'
অথৈ জলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অর্থহীন ভেবেছি কেবলি :
'আহা, কোন্ জলটা এখানে কংসের?'

নেকাব্বরের মহাপ্রয়াণ

নেকাব্বর জানে তাঁর সম্পত্তির হিসাব চাইতে আসবে না
কেউ কোনোদিন। এই জন্মে শুধু একবার চেয়েছিল একজন :
'কী কইর‍্যা পালবা আমারে, তোমার কি আছে কিছু তেনা?'
সন্ধ্যায় নদীর ঘাটে ফাতেমাকে জড়িয়ে দু'হাতে বুকে পিষে
বলেছিল নেকাব্বর : 'আছে, আছে, লোহার চাকার মতো
হাত, গতরে আত্তীর বল, -আর কীডা চাস্ মাগী।'
'তুমি বুঝি খাবা কলাগাছ?'
আজ এই গোধূলিবেলায় প্রচণ্ড ক্ষুধার জ্বালা চোখে নিয়ে
নেকাব্বর সহসা তাকালে ফিরে সেই কলাবাগানের
গাঢ় অন্ধকারে। তিরিশ বছর পরে আজ বুঝি সত্য হলো
ফাতেমার মিষ্টি উপহাস।
পাকস্থলী জ্বলে ওঠে ক্ষুধার আগুনে, মনে হয় গিলে খায়
সাজানো কদলীবন, যদি ফের পায় এতটুকু শক্তি
দু'টি হাতে, যদি পায় দাঁড়াবার মতো এতটুকু শক্তি দু'টি পায়ে।

কিন্তু সে কি ফিরে পাবে ফের?
ফাতেমার মতো ফাঁকি দিয়ে সময় গিয়েছে ঢের চলে।

কারা যেন ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গেছে সব শক্তি তার ।
বিনিময়ে দিয়ে গেছে ব্যাধি, জরা দুর্বলতা, বক্ষে ক্ষয়-কাশ—;
অনাদর, অনাহারে কবরে ডুবেছে সূর্য, ফাতেমার তিরিশ বছর ।
এখন কোথায় যাবে নেকাব্বর ?
হয়তো গিলেছে নদী তার শেষ ভিটেখানি, কবর ফাতেমা,
কিন্তু তার শ্রম, তার দেহবল, তার অকৃত্রিম নিষ্ঠা কারা নিলো ?
আজ এই গোধূলিবেলায় এই যে আমার পৃথিবীকে মনে হলো পাপ,
মনে হলো হাবিয়া দোজখ ; কেউ কি নেবে না তার এতটুকু দায় ?
মানুষ পৃথিবী ছেড়ে চায় না সুদূরে চলে যেতে, নেকাব্বর ভাবে,
অজানা অচেনা স্বর্গে বুঝি মেটে বাস্তবের তৃষ্ণা কোনোদিন ?
তবু যারা চায়, তারা কেন চায়? তারা কেন চায় ? কেন চায়?

নেকাব্বর শুয়ে আছে জীবনের শেষ ইষ্টিশনে । তার পচা বাসী শব
ঘিরে আছে সাংবাদিক দল । কেউ বলে অনাহারে, কেউ বলে অপুষ্টিতে,
কেউ বলে বার্ধক্যজনিত ব্যাধি,—নেকাব্বর কিছুই বলে না ।

তার আগে চাই সমাজতন্ত্র

তোমাকে নিশ্চয়ই একদিন আমি কিনে দিতে পারবো
একসেট সোনার গহনা, নিদেনপক্ষে নাকের নোলক একখানা ।
তোমাকে নিশ্চয়ই একদিন আমি কিনে দিতে পারবো একটি
আশ্চর্য সুন্দর ইজিপ্সীয়ান কার্পেট । মখমল-নীল শাড়ি প'রে
তুমি ভেসে বেড়াবে সারা ঘরময় রাজহাঁস ;
—কিন্তু তার আগে চাই সমাজতন্ত্র।
তোমাকে নিশ্চয়ই একদিন আমি কিনে দিতে পারবো একটি ছোট্ট
সুন্দর লেফ্‌টহ্যাণ্ড ড্রাইভ গাড়ি, হলুদ, খয়েরী, নীল, যা চাও।
তুমি মধুপুর কিংবা ঢাকায় ছুটে যেতে পারবে দ্রুত, আরামে,
যখন যেমন ইচ্ছে । তোমাকে নিশ্চয়ই একদিন আমি কিন দিতে
পারবো জাপানের সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখার টিকিট,
কিংবা কক্সবাজারের ধু - ধু বেলাভূমি, নীল সাগরের ঢেউ,
শৈলচূড়ার মেঘ আর আন্তর্জাতিকতাময় নীলাকাশ ......।
— কিন্তু তার আগে চাই সমাজতন্ত্র ।

তোমাকে নিশ্চয়ই একদিন কিনে দেবো একটি সবুজ রঙের

হাঙ্গেরিয়ান ব্রা এবং একটি আশ্চর্য লাল সূর্যের মতো স্কার্ফ।
তোমার নরোম কোমল কোল জুড়ে নিশ্চয়ই একদিন
সবুজ পাতার মতো ফুটফুটে শিশু ফুটবে, বৃষ্টিধারার মতো
পর্বতের ঢালু বেয়ে নেমে আসবে তার খিলখিল হাসির শব্দ।
—কিন্তু তার আগে চাই সমাজতন্ত্র।
একদিন নিশ্চয়ই আমাদের পৃথিবী আর এরকম থাকবে না,
একদিন নিশ্চয়ই অনেক মানুষের স্বপ্ন এসে একটি বিন্দুতে মিলবে।

স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো

একটি কবিতা লেখা হবে তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে
লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে
ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে : 'কখন আসবে কবি ?'

এই বৃক্ষে ফুলে শোভিত উদ্যান সেদিন ছিল না,
এই তন্দ্রাচ্ছন্ন বিবর্ণ বিকেল সেদিন ছিল না।
তা হলে কেমন ছিল সেদিনের সেই বিকেল বেলাটি ?
তা হলে কেমন ছিল শিশু পার্কে, বেঞ্চে, বৃক্ষে, ফুলের বাগানে
ঢেকে দেয়া এই ঢাকার হৃদয় মাঠখানি ?

জানি, সেদিনের সব স্মৃতি মুছে দিতে হয়েছে উদ্যত
কালো হাত। তাই দেখি কবিহীন এই বিমুখ প্রান্তরে আজ
কবির বিরুদ্ধে কবি,
মাঠের বিরুদ্ধে মাঠ
বিকেলের বিরুদ্ধে বিকেল,
উদ্যানের বিরুদ্ধে উদ্যান,
মার্চের বিরুদ্ধে মার্চ ......।

হে অনাগত শিশু, হে আগামী দিনের কবি,
শিশু পার্কের রঙিন দোলনায় দোল খেতে খেতে তুমি
একদিন সব জানতে পারবে ; আমি তোমাদের কথা ভেবে
লিখে রেখে যাচ্ছি সেই শ্রেষ্ঠ বিকেলের গল্প।
সেদিন এই উদ্যানের রূপ ছিল ভিন্নতর।
না পার্ক না ফুলের বাগান, — এসবের কিছুই ছিল না,

শুধু একখণ্ড অখণ্ড আকাশ যেরকম, সেরকম দিগন্ত প্লাবিত
ধু-ধু মাঠ ছিল দুর্বাদলে ঢাকা, সবুজে সবুজময় ।
আমাদের স্বাধীনতা প্রিয় প্রাণের সবুজ এসে মিশেছিল
এই ধু-ধু মাঠের সবুজে ।

কপালে কব্জিতে লালসালু বেঁধে
এই মাঠে ছুটে এসেছিল কারখানা থেকে লোহার শ্রমিক,
লাঙল জোয়াল কাঁধে এসেছিল ঝাঁক বেঁধে উলঙ্গ কৃষক,
পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে এসেছিল প্রদীপ্ত যুবক ।
হাতের মুঠোয় মৃত্যু, চোখে স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল মধ্যবিত্ত,
নিম্ন মধ্যবিত্ত, করুণ কেরানী, নারী, বৃদ্ধ, বেশ্যা, ভবঘুরে
আর তোমাদের মতো শিশু পাতা-কুড়ানীরা দল বেঁধে ।
একটি কবিতা পড়া হবে, তার জন্য কী ব্যাকুল
প্রতীক্ষা মানুষের : 'কখন আসবে কবি?' 'কখন আসবে কবি ?'

শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন ।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার
সকল দুয়ার খোলা । কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী ?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর-কবিতাখানি
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের ।

নীরার বাগান

যত না এঁটেল মাটি তার চেয়ে বেশি ছিল বালি ।
এই বালির ভিতরে ধীরে ধীরে জীবনের ফুলকে ফোটানো
কাজটা সহজ ছিল না মোটেও ।
তার জন্য শ্রম চাই, চাই নিষ্ঠা, চাই ভালোবাসা,
চাই প্রয়োজন মতো জল, আলো, হাওয়া।
ভয় ছিল যদি বালিভারাক্রান্ত এই মাটির ভিতরে
সযত্নে প্রোথিত গাছগুলো মরে যায়?

যদি বালির ভিতরে পরাজিত হয় মাটি, যদি পণ্ড হয় শ্রম ?
যদি না অঙ্কুরিত হয় বীজ, যদি না প্রস্ফুটিত হয় পাতা,
প্রাণস্পর্শে যদি না জাগ্রত হয় ফুল ?

ভালোবাসা জয়ী হলো । বালি পেলো মাটির মমতা,
গাছের শিকড় পেলো বিশ্বস্ত আশ্রয় । দেখতে দেখতে
বসন্তের দুরন্ত সবুজ ছড়িয়ে পড়লো সবখানে ।
নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ শেষে যেন কোনো গুহার আঁধারে
প্রবেশিল প্রভাত পাখির কলতান । কোদাল ও খুরপির
মুখে চুমো খেয়ে জয়ী হলো নীরার বাগান ।

তারপর থেকে রাতের আঁধারে কুঁড়ি, দিনে রাঙা ফুল ।
যেদিকে তাকাই দেখি কৃষ্ণগাঁদা, কসমস আর ডালিয়ার হাসি ।
বুঝি তাই আজো আমি পৃথিবীকে এত ভালোবাসি ।
বলি, চিরপুষ্পময় হে পৃথিবী, আমাকে আবৃত করো,
আমাকে আবৃত করো, আমাকে আবৃত করো তোমার কুসুমে ।

আমার অক্লান্ত শ্রমে এ বাগান হয় নি নির্মিত জানি ।
আমি শুধু তার বন্দনার হার ভালোবেসে করেছি রচনা বারবার,
সেই অধিকারে ফুলের ভিতরে আজো মানুষের স্বর্গ টেনে আনি ।
বলি, বালিতে ফুটেছে ফুল, দেখে যাও স্বর্গের দেবতা,
ভালোবাসা কী ফুল ফোটাতে পারে দেখো ।
দেখো মানুষের নিষ্ঠা কত কোমল সুন্দর হতে পারে ।

এখন বসন্ত নেই, নেই ফুল বাগানের সেই অনুকূল ঋতু ।
অপসৃত কৃষ্ণগাঁদা কসমস আর ডালিয়ার হাসি,
দৃঢ়, ঋজু, বলবান সূর্যমুখীটিও অগ্নিবাণে মৃত।
এখন জমেছে ধুলো পুষ্পহীন গাছের গোড়ায়।
এই পুষ্পপ্রতিকূল গ্রীষ্মে আবার নীরার কাছে যাই, বলি,
ফুল দাও হে ফুলের শ্রমিক, এ গ্রীষ্মের যোগ্য ফুল দাও ।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি বাগানের শেষ প্রান্তে পাপড়ি মেলেছে
এক অপরূপ মুগ্ধ কলাবতী, রক্তে ভেজা লালসালু ;
যেন মিছিলের অগ্রভাগে বিপ্লবের আসন্ন পতাকা ।

লেনিন বন্দনা

মানবের বাসযোগ্য পৃথিবী ছিল না পৃথিবীতে ।
অথচ মানুষ ছিল, ছিল উর্বর মৃত্তিকা,
ছিল পাহাড়, অরণ্য, নদী, সীমাহীন সমুদ্র, আকাশ ।
ছিল ধর্ম, কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ।
তবু মানবের বাসযোগ্য পৃথিবী ছিল না পৃথিবীতে ।
ছিল দানব দাপটে কম্পমান এক মানব সমাজ,
যেন মরূদ্যানহীন কোনো মরু ।

মহামানবেরা এসেছেন দল বেঁধে মানুষের মুক্তিবাণী নিয়ে।
তাঁরা বলেছেন : 'ভালোবাসো, অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো ।
তাতেই কল্যাণ, শান্তি।'

আমরা তাদের কথা মেনেছি মন্ত্রের মতো ।
তাই ভালোবেসে ঝড়ে, জলে কর্ষণ করেছি ভূমি,
বুনেছি স্বপ্নের বীজ, ফলেছে ফসল ।
নিয়ে গেছে ভূস্বামীর দল । দেখেছি চুপটি করে ।
আমার ক্ষুধার কথা ক্ষণিকের তরে স্মরণে রাখে নি কেউ ।

ভালোবেসে ভাঙিয়া পর্বত নির্মাণ করেছি পথ অহোরাত্র শ্রমে,
সভ্যতা বেড়েছে ক্রমে ক্রমে । সে পথে আসে নি মুক্তি ।
পরদিন তৈরী পথ ধরে আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছে
এসে শোষকের রথ, কেড়ে নিতে শেষ শস্যকণা। যখন বলেছি :
'প্রভু অনেক দিয়েছি আর তোমাকে দেবো না ।'
তখনই তাদের হাতে ঝলসে উঠেছে অস্ত্র, যেন ক্রুদ্ধ
দংশন উদ্যত শত নাগিনীর ফণা ঘিরেছে আমাকে অসহায় ।

নিরুপায় অনাথের অশ্রুসিক্ত চোখে পাথরে কুটেছি মাথা ।
প্রতিকারে অপারগ যে নিষ্ঠুর প্রাণের দেবতা সুচতুর ছলনায়
ফিরিয়ে রেখেছে মুখ, তাকেও বেসেছি ভালো ।
তারপর বিশ্বাসে পড়েছে ভাটা, ভেতরে জমেছে ঘৃণা,
নতুন জীবন স্বপ্ন কুঁড়ি মেলে ফুটেছে হৃদয়ে ।
তাই সত্য কিনা, সে কথা জানার আগে
কত প্রিয় সময় ফুরালো পৃথিবীর ।
তারপর তুমি এলে ।

সেটা কোন্ সাল ?
হোক না তা যে কোনো বছর, এই যে বিগত [illegible]কাল
আছে অনাগত কালে মুখ গুঁজে, তার পিঠে, চাবুকের
ক্ষত দগ্ধ পুঁজে তুমি এসে ভালোবেসে করেছো চুম্বন ।
ওটাই স্মরণে থাক মানুষের ।

কোথায় তোমার জন্ম ?
হোক না তা সিমবির্স্ক কিংবা কোনো ভলগার তীরে,
তোমার জন্মের অর্থ বদলে দিয়েছে এই জরাজীর্ণ
দীর্ণ পৃথিবীরে, ওটাই স্মরণে থাক মানুষের ।

ব্যক্তিবিশেষের স্তুতি অর্থহীন তোমার দৃষ্টিতে ।
জানি, তোমার বিশ্বাস অমোঘ সত্যের মতো
ধাবমান মহাবিশ্বে, মহাকাশে, মহাকাল মাঝে ।
দানবিক গ্রন্থিজাল ছিন্ন করে মানবকল্যাণ স্বপ্ন
রচিয়াছো তুমি; পুরাতন পৃথিবীর 'পরে
সৃজিয়াছো নববিশ্ব মানবের বাসযোগ্য করে ।

মার্কসের দ্বান্দ্বিক দর্শন যে সত্য ধারণ করে
আপনার মাঝে ছিল আত্মলীন তত্ত্বের আকারে
তুমি তার শ্যামল স্বপ্নের পদতলে বিছিয়ে দিয়েছো
এনে পৃথিবীর অকর্ষিত মাটি ।
মরুতে ফুটেছে পদ্ম, তুমি তার জীবন্ত মৃণাল ।
হোক না তা দূরে কোনো ভলগার তীরে,
তোমার বিপ্লববাণ বদলে দিয়েছে জানি
অন্যায় আকীর্ণ পৃথিবীরে ।
ওটাই স্মরণে থাক মানুষের ।

আমি অতি হীনমতি বাংলার বিপন্ন চারণ,
তোমাকে স্মরণ করে রক্তের অক্ষরে লিখি
তোমার প্রশস্তি গাঁথা। যেমন প্রশস্তি গাই
হেমন্তের চাঁদে ধোয়া নীল আকাশের,
যেমন প্রশস্তি গাই রাত্রি শেষে রক্তিম সূর্যের ;
তেমনি তোমার নাম ভালোবেসে লিখি প্রতিদিন :
ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন ।

প্রলেতারিয়েত

যতক্ষণ তুমি কৃষকের পাশে আছো,
যতক্ষণ তুমি শ্রমিকের পাশে আছো,
আমি আছি তোমার পাশেই ।
যতক্ষণ তুমি মানুষের শ্রমে শ্রদ্ধাশীল
যতক্ষণ তুমি পাহাড়ী নদীর মতো খরস্রোতা
যতক্ষণ তুমি পলিমৃত্তিকার মতো শস্যময়
ততক্ষণ আমিও তোমার ।

এই যে কৃষক বৃষ্টিজলে ভিজে করছে রচনা
সবুজ শস্যের এক শিল্পময় মাঠ,
এই যে কৃষক বধূ তার নিপুণ আঙুলে,
ক্ষিপ্র দ্রুততায় ভেজা পাট থেকে পৃথক করছে আঁশ ;
এই যে রাখাল শিশু খররৌদ্রে আলে বসে
সাজাচ্ছে তামাক আর বারবার নিভে যাচ্ছে
তার খড়ে বোনা বেণীর আগুন,
তুমি সেই জীবনশিল্পের কথা লেখো ।

তুমি সেই বৃষ্টিভেজা কৃষকের বেদনার কথা বলো ।
তুমি সেই রাখালের খড়ের বেণীতে
বিদ্রোহের অগ্নি জ্বেলে দাও ।
আমি তোমার বিজয়গাঁথা করবো রচনা প্রতিদিন ।
সেই শিশু শ্রমিকের কথা তুমি বলো, যে তার
দেহের চেয়ে বেশী ওজনের মোট বয়ে নিয়ে যায়,
ব্রাশ করে জুতো, চালায় হাঁপর, আর বর্ণমালাগুলো
শেখার আগেই যে শেখে ফিল্মের গান,
বিড়ি টানে বেধড়ক । তারপর একদিন ফুঁটো ফুসফুসে
ঝরিয়ে রক্তের কণা টানে যবনিকা জীবনের ।
তুমি সেই শিশু শ্রমিকের বেদনার কথা বলো ।
আমি তোমার কবিতাগুলো গাইবো নৃত্যের তালে তালে
বুদ্ধিজীবীদের শুভ্র সমাবেশে । তুমি উদ্বৃত্ত মূল্যের সেই
গোপন রহস্য বলে দাও, আমি তোমার পেছনে আছি ।

যতক্ষণ তুমি সোনালি ধানের মতো সত্য,
যতক্ষণ তুমি চায়ের পাতার মতো ঘ্রানময়,
যতক্ষণ তুমি দৃঢ়পেশী শ্রমিকের মতো প্রতিবাদী,
যতক্ষণ তুমি মৃত্তিকার কাছে কৃষকের মতো নতমুখ,
ততক্ষণ আমিও তোমার ।

তুমি রুদ্র কাল বোশেখীর মতো নেমে আসো
নগরীর ঐ পাপমগ্ন প্রাসাদগুলোর বুকে,
বজ্র হয়ে ভেঙে পড়ুক তোমার নতুন কাব্যের ছন্দ
শিরস্ত্রাণপরা শোষকের মাথার উপরে ।
আমি তোমার বিজয়বার্তা করবো ঘোষণা জনপদে ।

তুমি চূর্ণ করো অতি-বুদ্ধিজীবীদের সেই ব্যূহ,
কৃত্রিম দর্শন আর মেকি শিল্পের প্রলেপে
যে আছে আড়াল করে সত্য আর সুন্দরের মুখ ।
আমি তোমার পেছনে আছি । তুমি খুলে দাও সেই
নব জীবনের দ্বার, পরশনে যার পৃথিবীর অধিকার
ফিরে পায় প্রলেতারিয়েত ।

আমি এই বীরভোগ্যা বসুন্ধরা দেবো তোমাকেই ।

লাল মলাটের বইগুলি

এত লাল আমি কোথাও দেখি নি ।
ফুলে বা অস্তরাগে,
যত লাল দেখি তার চেয়ে বেশী
এই লাল চোখে লাগে ।

রক্তে এ লাল আগুন ছড়ায়
চেতনাকে করে সংহত,
জড় দর্শন খুলে দেয় জটা
ছন্দের জালও অংশত ।
বর্ণশ্রেষ্ঠ এই লাল জানে
প্রলেতারিয়েত কী সে চায়,

ভেতরের কালো বর্ণমালারা
কী যে বিদ্রোহ জানে হায়!

এই লাল জানে সর্বহারার
কাস্তে-হাতুড়ি-চাঁদের ছন্দ,
বুর্জোয়া সব করে কলরব
তোলে শিল্পের বাতিল দ্বন্দ্ব ।

বুঝি বাবুদের লাল রক্তের
পড়ে গেছে খুব টানাটানি,
শুরু হয়ে গেছে যুদ্ধ ভীষণ
সম্মুখে রণ আছেই জানি।
কমরেড লাল চেতনার রঙে
রাঙা রক্তিম বিশ্বের,
পদধ্বনি বাজে আমার রক্তে
হুংকার শুনি নিঃস্বের ।

বুঝি মজুরের-কিষাণের হাতে
ঝলমল করা খড়্গের,
দিন আসে ঐ মাভৈঃ মাভৈঃ
কাঁপে ঈশ্বর স্বর্গের ।

বছরের শেষ সূর্য

বছরের শেষ সূর্য দিবসের শেষ দৃষ্টি মেলে
পশ্চিমের অস্তাচলে এসে থমকে দাঁড়ালো স্থির,
নির্বাসনে যাবার সময় নিঃশব্দ চরণ ফেলে
যে ভাবে নিমাই এসে দীপ হাতে প্রিয়তমা স্ত্রীর
মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন । অথবা সে কালরাতে
মৃত্যু হাতে দেসদিমোনার গৃহে যেমন ওথেলো ।

'কে এলো ? কে এলো ?' বলে উন্মীলিত পদ্মনেত্র মেলি
দেখিল দিনের সূর্য,— বসুন্ধরা ডুবিছে কেবলি
নিস্তব্ধ সমুদ্র মাঝে, অরণ্যে, পর্বতে, সাহারায় ।

—এইভাবে মানুষেরা একদিন সর্বস্ব হারায়।
সকরুণ অস্তরাগে যৌবনের রণরঙ্গিনীরা,
দেখে দ্রুত অঙ্গ থেকে খসে পড়ে অন্ধকার বিহঙ্গীরা,
মৃত্যুর জড়তা ভাঙে জীবনের মুক্ত পাখা মেলি।
আবার আকাশ জাগে, আবার জীবন জাগে জয়ে ;
গত সূর্য আসে ফের বছরের নব সূর্য হয়ে ।

শ্রমিক ও ঈশ্বর

'দল বেঁধে কী খোঁজো তোমরা এত মন্দিরে গীর্জায় ?
কিছু হারিয়েছো বুঝি?' —ভক্তবৃন্দ গর্জে ওঠে প্রায় :
'হায় লোকটা পাগল ? শয়তান ? নাকি রাতকানা ?'
'আমরা ঈশ্বর খুঁজি, তুমি বুঝি কিছুই জানো না ?'

'জানি, তবে জীবনে কখনো ঈশ্বর দেখিনি কিনা'
তাই ঠিক বুঝতে পারি না তার মূল্য কতখানি ।
দিনের কাজের শেষে একটি আধুলি পাই হাতে ;
ভালোবেসে পুজো করি, তাকেই ঈশ্বর ভাবি রাতে '।

পরস্পর কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসে তাঁরা :
'লোকটা নিরেট মূর্খ, অনায়াসে পাপী বলা যায় '।
বুঝি ভক্তবৃন্দ ক্ষেপে গেছে খুব, এটা স্বাভাবিক,
ভেবে ওদের সান্ত্বনা দিই, বলি : 'তা ঠিক, তা ঠিক,
পাপী কিনা একথা জানি না, তবে মূর্খ-যে তা মানি,
— তা না হলে দিনের মজুরি কেউ এভাবে হারায়?'

বেদনায় অশ্রু আসে চোখে, দেখে হাসে ভক্তবৃন্দ :
'এ কী, একে নিয়ে ভারী জ্বালা হলো দেখি আমাদের ;
একটি আধুলি বৈ তো নয়, তার জন্য এত মায়া ?
যাই বলো ভাই, লোকটা বেহায়া ছাড়া কিছু নয় ।'

'আরো ঈশ্বরের অসীম করুণা সবাই কি পায়'।
'আর যেন না হারায়'—বলে ক্রুদ্ধ অন্য একজন
নিজের পকেট থেকে একটি আধুলি দ্যায় ছুঁড়ে ;
আর সেই আধুলিটা অন্ধকারে প্রজ্বলিত হয়ে
বৃত্তাকারে ঘুরে থামে শ্রমিক পায়ের কাছে এসে ।
'কে সে ?' — এই প্রশ্ন তখন আঁধারে ভেসে আসে।

খেয়ার মাঝি দলে নেয় না

একটু বড় হয়েছি কি হই নি, চারদিক থেকে
হৈ চৈ করে উঠলো মানুষ,
যেন আমি একটি প্রকাণ্ড মই কাঁধে নিয়ে
ঘুরে বেড়াচ্ছি কারো পাকা ধানের খোঁজে ।
অথচ ভিটেয় ঘুঘু চড়ানো আমার কর্ম নয়,
আমি বরং উল্টো কাজের মানুষ ।

আমি ছুটছি নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে
খরস্রোতে সাঁতার কাটতে ।
বিকেলবেলায় ব্রহ্মপুত্রের তীর ঘেঁষে
আমি দৌড়োচ্ছি সূর্যাস্তের মুখোমুখি ।
আমার স্বাস্থ্যটা আরো ভালো হওয়া দরকার ।

আলস্য থেকে মুক্তি নিয়ে সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে
এখন আমার শয্যা ছাড়ার সময় ।
একটু বড় হয়েছি কি হই নি, চারদিক থেকে এত
গেলো গেলো রব উঠছে কেন ? শুধু কি মানুষ ?
আকাশ আমাকে দেখিয়ে বলছে : 'ঐ যে, ঐ যে,
ঐ ছেলেটা ।' নদী বলছে : 'এখানে কেন ?
এখন তুমি বড় হয়েছো, সমুদ্রে যাও ।'
বাতাস বলছে : 'ছেলে কোথায় ? এ যে দেখছি
বড়ো মানুষ, লোকটা বলো ।'

ময়মনসিংহ তাকিয়ে থাকে অবাক হয়ে :
'এই শহরে কখন এলে ?
তুমি না সেই ঢাকায় ছিলে ?'
খেয়ার মাঝি দলে নেয় না ।
কুলিরা সব প্রশ্ন করে : 'তুমি এমন ফর্সা কেন,
আমরা তো চাই ময়লা মানুষ ।'

আমি এখন ময়লা মানুষ কোথায় পাবো ?

বৃষ্টির বন্দনা

এখানে কোনোই কৃতিত্ব নেই কবিতার, অর্থাৎ কবির।
সে যে কবিতা হয়েই এলো ।
মধ্যরাতে যখন নিদ্রিত সব সে নামিল অঝোর ধারায় ।
কবিতার অত ছন্দ নেই, এত সুর ছিল না ভাষায় ।
নিকটে আসিল দূর, বৃষ্টিতে বাজিল প্রাচীন কবির ছন্দসুর ।

জগৎ প্লাবিয়া গেলো আজ রাতে, এমন বৃষ্টিতে হায়,
সখি, তুমি না জানি কোথায় ?
এমন বৃষ্টির চেয়ে প্রিয় কিছু নেই পৃথিবীতে । মনে হলো
আকাশ আগ্রহী হলো আজ রাতে আমার হৃদয় ভরে দিতে ।

তোমার হাতের মৃদু চুড়ির কিঙ্কিণি, রিনিঝিনি
এভাবে বৃষ্টির মতো কখনো বাজে নি আগে,
কবি বসে বৃষ্টিধোয়া জানালার পাশে রাত্রি জাগে ।
মানুষের দৃষ্টি অন্ধ করে বৃষ্টির প্রদীপ হাতে
কেউ কি আঁধারে ভেসে আসে ?
সে কি ছন্দ না কি সুর ? সে কি টোরি না বেহাগ ?
হে আকাশ, কী রাগ বাজালে তুমি এ মেঘ-মল্লারে,
কী গান শোনালে তুমি আজ রাতে তোমার কবিরে ?

সে আজ উন্মাদ হলো তোমা পানে চেয়ে।
তোমার আঁচলে ঢেকে মুখ
কাঁপিল সে বৃক্ষপত্রসম ।
মিলন উন্মুখ হলো রাত্রি তার,
প্রিয়তম আঁধারে ঘিরিল চারিধার ।

এখানে কোনোই কৃতিত্ব নেই কবিতার, অর্থাৎ কবির ।

তৃষিত মাটির বুকে উজাড় করিয়া জল ঢালি
আকাশ-হইতে নামিয়া আসিল মালী ।
প্রাচীন কবির মতো বসে মেঘের কলমে ঘষে
লিখিল সে এই কাব্য পৃথিবীর মাটির কাগজে,

গাছের পাতায়, ঘাস শীষে,
দরদালানোর ভাঙা ছাদে, টিনের কার্নিশে।
নিদ্রিতার ঘুমের ভিতরে আঁখি চিরে চিরে
রচিল সে সুখনিদ্রা অভ্রবিন্দুসম।
'নমো নমো নমো' জপমন্ত্রে প্রকৃতি পূজিল তারে
চমকিত বিজুলি আঁধারে নিরূপম।
বুঝিবা রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মপুত্রে ভাসিয়ে তরণী নত শিরে
শুভ্রজটাচুলে জানালেন মধ্যরাতে স্বাগত বৃষ্টিরে।

দেখে যা, দেখে যা সখি, আয়,
কেমন করিয়া আমার হৃদয় জগৎ প্লাবিয়া যায়
আজ এই ঘনঘোর বরিষায়।
এখানে কোনোই কৃতিত্ব নেই কবিতার, অর্থাৎ কবির।

রবীন্দ্র সঙ্গীত

১

ধূলির ভিতরে কোনো জীবনের গান আছে কিনা,
জানে রুদ্র বৈশাখের বিহ্বল বাতাস, সে তাকে ওড়ায়।
নদীর চঞ্চল স্রোতে মিলনের সুর আছে কিনা
সে কথা সমুদ্র জানে, সে নদীকে টানে।
পাতার মর্মরধ্বনি বাঁধা আছে কীভাবে নিশ্ছিদ্র ধ্রুবপদে,
কোন্ ফুল ফোটে কোন্ গানে, — জানে তা বনের পিক।
সে থাকে পাতার নিচে, বনে। তুমি কবি, মানুষের ঘরে জন্ম,
তা-ও গ্রামে নয় ; তবু মনে হয় তুমি পাখি, তুমি নদী,
তুমি সত্য সবার অধিক। তুমি পাখির অধিক পাখি,
নদীর অধিক নদী, ধূলির অধিক ধূলি, ফুলের অধিক ফুল।

আমি নই জাতশিল্পী, উপরন্তু কণ্ঠ নেই সাধা
প্রাণ যদি পূর্ণ মেলে কণ্ঠ মেলে আধা।
তাই, নির্জনে নিভৃতে বসে অপ্রকাশ্যে গাই,
তোমার সঙ্গীতগুলি। দুঃসাহস কোথায় লুকাবো ?
তোমার কবিতা পড়ে ভাল থাকি, গান শুনে দিন যায়।
স্বপ্নভ্রষ্ট ক্ষতবিশ্বে সেরে উঠি তোমার সুরের শুশ্রূষায়।

২

দুপুরের দৈব রোদে গলে আমার বসনখানি
পথশ্রমে বারবার ভীষন অচেনা হয়ে ওঠে :
কত দূরে বাজে সেই গান আর পাতার মর্মর ?
নিজের ভিতর থেকে পরগুলি খুলে খুলে দেখি,
পরের অপরে মিশে তারপর লেখি তার নাম,
পথ যাকে পথপ্রান্তে কোনোদিন করে না স্মরণ ।
দুপুরের রোদে তবু পথিকের সামান্য বিশ্রাম
পূর্ণ করে সুরের অঞ্জলি, রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলি
হৃদয়ে তরঙ্গে তোলে, মিলনে মিলায় ঘৃণা।
তখন তরঙ্গ বুঝি, তার অনুষঙ্গ যদিও বুঝি না ।

জলে -স্থলে-দূর্বাদলে, আলোকে-আঁধারে যারে
দেখিবারে চাই, অথচ যে মুখখানি সম্পূর্ণ দেখি না ,
তোমার ঝংকৃত তারে তার মুখ কিছু চেনা যায় ।
গেরুয়া বসনে ঢাকা সে-মুখের সামান্য ইশারায়
মৃতের মনুষ্য জন্ম জীবনের পূর্ণতাকে পায়।
তখন অনন্ত বুঝি, তাকে অফুরন্ত যদিও বুঝি না ।

কাশফুলের কাব্য

ভেবেছিলাম প্রথম যেদিন
ফুটবে তুমি দেখব,
তোমার পুষ্প বনের গাথা
মনের মতো লেখব ।

তখন কালো কাজল মেঘ তো
ব্যস্ত ছিল ছুটতে,
ভেবেছিলাম আরো ক'দিন
যাবে তোমার ফুটতে ।

সবে তো এই বর্ষা গেল
শরৎ এলো মাত্র,
এরই মধ্যে শুভ্র কাশে
ভরলো তোমার গাত্র ।

ক্ষেতের আলে, নদীর কূলে
পুকুরের ঐ পাড়টায়,
হঠাৎ দেখি কাশ ফুটেছে
বাঁশবনের ঐ ধারটায়!

আকাশ থেকে মুখ নামিয়ে
মাটির দিকে নুয়ে,
দেখি ভোরের বাতাসে কাশ
দুলছে মাটি ছুঁয়ে ।

কিন্তু কখন ফুটেছে তা
কেউ পারে না বলতে,
সবাই শুধু থমকে দাঁড়ায়
গাঁয়ের পথে চলতে ।

পুচ্ছ তোলা পাখির মতো
কাশবনে এক কন্যে,
তুলছে কাশের ময়ূর চূড়া
কালো খোঁপার জন্যে ।

যেন শরত-রাণী কাশের
বোরখাখানি খুলে,
কাশবনের ঐ আড়াল থেকে
নাচছে দুলে-দুলে ।

প্রথম কবে ফুটেছে কাশ
সেই শুধু তা জানে,
তাই তো সে তা সবার আগে
খোঁপায় বেঁধে আনে ।

ইচ্ছে করে ডেকে বলি :
'ওগো কাশের মেয়ে,
আজকে আমার চোখ জুড়ালো
তোমার দেখা পেয়ে।'

'তোমার হাতে বন্দী আমার

ভালোবাসার কাশ,
তাই তো আমি এই শরতে
তোমার ক্রীতদাস ।"

ভালোবসার কাব্য শুনে
কাশ ঝরেছে যেই,
দেখি আমার শরত-রানী
কাশবনে আর নেই ।

ক্ষেতমজুরের কাব্য

মুগুর উঠছে মুগুর নামছে
ভাঙছে মাটির ঢেলা,
আকাশে মেঘের সাথে সূর্যের
জমেছে মধুর খেলা ।

ভাঙতে ভাতে বিজন মাঠের
কুয়াশা গিয়েছে কেটে,
কখন শুকনো মাটির তৃষ্ণা
শিশির খেয়েছে চেটে ।

অতটা খেয়াল রাখেনি কৃষক
মগ্ন ছিল সে কাজে,
হঠাৎ পুলক পবনে হৃদয়
পুষ্পিত হলো লাজে।

ফিরিয়া দেখিল বধূটি তাহার
পেছনে আলের 'পরে
বসে আছে যেন ফুটে আছে ফুল
গোপনে চুপটি করে ।

সামনে মাটির লাল সানকিটি
জরির আঁগলে বাঁধা,
আজ নিশ্চয় মরিচে রসুনে
বেনুন হয়েছে রাঁধা ।

হাসিয়া কৃষক মরাল বাঁশের
মুগুর ফেলিয়া দিয়া
কামুক আঁখির নিবিড় বাঁধনে
বাঁধিল বধূর হিয়া ।

বরুণ গাছের তরুণ ছায়ায়
দু'জনে সারিল ভোজ,
বধূর ভিতরে কৃষক তখন
পাইল মনের খোঁজ।

মেঘ দিল ছায়া, বনসঙ্গমে
পুরিল বধুর আশা —;
মনে যা-ই থাক, মুখে সে বলিল :
'মরগে' বর্গা চাষা।'

শব্দটি তার বক্ষে বিঁধিল
ঠিক বর্শার মতো ।
'এই জমিটুকু আমার হইলে
কার কি-বা ক্ষতি হতো ?'

কাতর কণ্ঠে বধূটি শুধালো :
'আইছ্যা ফুলির বাপ,
আমাগো একটু জমিন অবে না ?
জমিন চাওয়া কি পাপ ?'

'খোদার জমিন ধনীর দখলে
গেছে আইনের জোরে,
আমাগো জমিন অইব যেদিন
আইনের চাকা ঘোরে ।'

অসহায় বধূ জানে না নিয়ম
কানুন কাহারে বলে—;
স্বামীর কথায় চোখ দু'টি তার
সূর্যের মতো জ্বলে ।

'বলদে ঘোরায় গাড়ির চাক্কা,
নারীর চাক্কা স্বামী --;
আইনের চাকা আমারে দেখাও
সে-চাকা ঘুরামু আমি ।'

কৃষক তখন রুদ্র বধূর
জড়ায় চরণ দু'টি,
পা-তো নয় যেন অন্ধের হাতে
লঙরখানার রুটি ।

যতটা আঘাত সয়ে মৃত্তিকা
উর্বরা হয় ঘায়ে
ততটা আঘাত সইল না তার
বধূর কোমল পায়ে ।

পা দু'টি সরিয়ে বধূটি কহিল :
'কর কি ? কর কি? ছাড়ো,
মানুষে দেখলি জমি তো দেবি না,
দুন্যাম দেবি আরও ।'

পরম সোহাগে কৃষক তখন
বধূর অধর চুমি,
হাসিয়া কহিল : 'ভূমিহীন কই?
আমার জমি তুমি ।'

আকাশে তখনও সূর্যের সাথে
মেঘের করিছে খেলা,
মুগুর উঠছে মুগুর নামছে
ভাঙছে মাটির ঢেলা ।

পৃথিবীজোড়া গান

পৃথিবী নামের এই ছোট্ট গ্রহটিকে কখনও কখনও খুব
পূর্বপুরুষের ভিটে-বাড়ি বলে মনে হয় ।
তখন আনন্দে মন ভরে ওঠে, আহা কী যে ভালো লাগে !
গর্বে আমার পা পড়ে না মাটিতে ।

সমুদ্র দেখিয়ে বলি: 'এই যে গর্জনশীল মহাসিন্ধু বয়ে যাচ্ছে
তরঙ্গ বিহারে, তার আপন স্বভাবে, — এসব আমার ।'

রাতের নির্জন আকাশ দেখিয়ে বলি :'এই যে নক্ষত্রপুঞ্জ
অনাবৃত মহাকাশে ঝুলে আছে, — এগুলো আমার ।'

পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলি
'অফসেট নীলে মোড়া, ঐ যে তুষারে আবৃত চূড়া দেখা যায়,
ওখানে আমার স্বপ্ন চঞ্চল প্রপাতে বহমান ।'

উদিত সূর্যের দিকে দু'হাত উচিয়ে বলি :
'এই তো আমার দেশ, আমার জন্মভূমির শুরু,
দিনশেষে সে যেখানে অস্ত যাবে, সেখানে আমার শেষ।'
আপাতত এটুকু আমার হোক, পরে না হয় আবার
আমার অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়াকে আমি
অন্তহীন আকাশে পাঠাবো । আপাতত সূর্য হোক
আমার জন্মভূমির ভৌগোলিক সীমান্ত প্রহরী ।

আকাশ মৃত্তিকা ঘেরা এ-পৃথিবী দয়াবতী জননী আমার ।
তার গর্ভদেশ পড়েছে বঙ্গীয় কাশবনে, তাই তাকে
ভালোবেসে বলি জন্মভূমি —বলি আমার স্বদেশ ।
জননী কি গর্ভস্থলটুকু শুধু? জননী কি শুধুই জরায়ু ?
—-জননী সমস্ত দেহ, তার আপাদমস্তক ।

জানি, জন্ম আর জন্মভূমি— এ দু'য়ের ফাঁক দিয়ে
প্রবেশ করেছে বৈরী কালের বাতাস, তাই শ্রেণীদ্বন্দ্বে
খণ্ডিত হয়েছে পৃথ্বী এতো খণ্ড-খণ্ড রূপে ।

এই দ্বন্দ্বে ঘুচে গেছে আবার সম্পূর্ণরূপে, মহামানবের
পুণ্যতীর্থে জাগিবেন জন্মভূমি, জননী আমার ।

সপ্তসিন্ধু, তেরো নদী, দশ দিগন্তের ডাকে
আবার নতুন করে ফিরে পাব হারানো সে মাকে ।
সাদা-কালো-শ্যামল-পিঙ্গল, দীর্ঘ-খাটো সকল মানুষ
সেদিন আবার এসে এক-কাতারে দাঁড়াবে ।

সেই মহামিলনের ভোরে সমস্ত পৃথিবীজুড়ে উঠবে নতুন সূর্য,
এককন্ঠে গীত হবে শতকোটি কন্ঠের সঙ্গীত ।
তার নব ভৌগোলিক শিখার আগুনে ভস্ম হবে পুরনো প্রাচির।
তখন এশিয়া মিলবে আফ্রিকার সনে, ভূমিহীন উপেনের মনে
যুক্ত হবে লুমুম্বার প্রাণ, - প্রসারিত হবে জন্মভূমি ;
আর ধ্বনিত হবে নতুন পৃথিবীজোড়া গান ।

সাতই আষাঢ়

আবার এসেছে ফিরে সাতই আষাঢ় ।
কালোমেঘে আকাশ ভরিয়ে,
প্রকৃতির চোখে কবিতার কাজল পরিয়ে
সে এসে ডাক দিয়েছে আমাকে —
তার জন্মদিনের উৎসবে ।
এতদিন গুরুগুরু মেঘের গর্জনে
মিশেছিল বিদ্যুতের ডাক,
মনে হয়েছিল এ শুধু ঝড়ের পূর্বাভাস
এ শুধু শিলাবৃষ্টির খেলা ।

উড়ন্ত মেঘের আঁচলে লুকিয়েছিল
সুন্দরের মুখ, তার দীর্ঘতম বেলা।
শিশুর কান্নার মধ্যে সুপ্ত ছিল তার কন্ঠস্বর,
নিশ্চলতায় লুকানো ছিল তার ছন্দ—
সে আজ হঠাৎ এসে মিললো আমার
অন্তরের গোপন গুহায়।

পঁচিশে বৈশাখের মায়াবী খোলস ভেঙে
তরঙ্গশিখরস্পর্শী প্রভাতসূর্যের
প্রথম রশ্মির মতো
সে এসে লুটিয়ে পড়লো সাতই আষাঢ়ের
ছড়ানো-ছিটানো মেঘের চূড়ায়।
মাধুরীমন্দ্রিত মেঘদল উড়তে উড়তে এসে
পাখা মেলে বসলো আমার
হৃদয়মন্দির আলো করে ।
জন্মদিনের আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো
কল্পনার ব্যথিত আকাশ, সেই সাথে বুঝি
বাস্তবের পৃথিবীও গেলো পাল্টে।
পাখি হয়ে উঠলো গান,
আকাশ হয়ে উঠলো আমার হৃদয়,
মেঘ হয়ে উঠলো মুক্তি ।

ছন্দের সতর্ক প্রহরায় বন্দী অনুভব
চঞ্চল ঝর্ণার মতো সুউচ্চ পাহাড় থেকে
ঢল হয়ে নেমে এলো ইচ্ছেমতো পেখম ছড়িয়ে ।
দু'কূল ভাসিয়ে নদী ছুটলো সমুদ্রের অভিসারে,
গাঁয়ের মেঠোপথে বেজে উঠলো বিরহের বাঁশি ।

সাতই আষাঢ় আমাকে দু'হাত ধরে
টেনে নিয়ে গেলো মফস্বলের ঐ কাদাভরা পথে,
কাশবনের ছিন্ন কুটিরে, যেখানে আমার জন্ম,
আমার আঁতুড়ঘরের ভেজা মাটি।
অচেনা পাখির বিচিত্র সঙ্গীতে মুখরিত
প্রদোষবেলার প্রথম চিৎকার এখনো সেখানে
ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে,
খুঁজে বেড়ায় সাতই আষাঢ়ের এ কবিকে ।

না জানি সে আজ কোন্ রূপে
এসেছে আমার গাঁয়ে ?
কোন্ শাড়ি পরেছে সে ?
কোন্ ছন্দে হাওয়ায় দিয়েছে দোলা ?

আজ কোন্ রঙে মেতেছে আকাশ কাশবনে ?
প্রশংসাকাতর চিত্ত আজ ভিখিরির মতো
শূন্য পাত্র হাতে ছুটে যেতে চায়
আমি-শূন্য সেই গাঁয়ের উদ্দেশে।

সাতই আষাঢ় এলে সে আমার কণ্ঠে পরাতো
সদ্যফোটা কদমফুলের ঘ্রাণময় মালা,
কপালে আঁকতো বটপাতার সাদা কষের টিপ ।
আম-জাম-কাঁঠালের অঢেল উপঢৌকনে
আমার দুর্বৃত্ত রসনাকে করতো তৃপ্ত ।
বৃষ্টিমুখরিত দ্বি-প্রহরে এনে দিতো
গ্রাম্যললনার স্নানসিক্ত স্বপ্নের সন্ধান ।
তুলসিতলায় বধূরা জ্বালতো মঙ্গলপ্রদীপ,
আকাশ কাঁপিয়ে আজান উঠতো
ভক্তপ্রাণের রক্তে শিখার মতো ।
সকলের অগোচরে এইভাবে ক্রমাগত
আমার জন্মদিনের উৎসব হয়েছে চিহ্নিত,
সাতই আষাঢ় হয়েছে ধন্য ।

লাঙ্গল-জোয়াল কাঁধে ভোরের কৃষক
ক্লান্তসিক্ত হয়ে ফিরেছে সন্ধ্যায়।
কালবৈশাখীর ডাকে
বৈকালী আকাশ হয়েছে পাগল ।
বর্ষার প্রথম বর্ষণের ছোঁয়া পেয়ে
পুকুর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে মাছ;
পড়ার বই ছুঁড়ে ফেলে
দুর্বিনীত কিশোর ছুটেছে সেই পলাতক
মাছের সন্ধানে, বনবাদাড় ডিঙিয়ে।

শান্ত-স্থির আষাঢ়ের উচ্চাঙ্গ বর্ষণে
উদ্বেল হয়েছে তার চিত্ত, অজানাপুলকে
শিহরিত হয়েছে তার হৃদয় ।
স্বপ্ন এসে বারবার ভেঙেছে রাতের নিদ্রা ।
ষড়রিপু হয়েছে জাগ্রত । আঁটির অংকুর হয়ে

কোথায় লুকিয়েছিল এই কবি ?

হেলায় খেলায় কেটেছে আমার বেলা,
সন্ধ্যার সূর্যকে ফাঁকি দিয়ে
প্রসারিত হয়েছে আমার দিন ;
সংকুচিত হয়েছে আমার রাত্রি ;
কত প্রশ্ন রয়েছে উত্তরহীন পড়ে—
তবুও সামান্য বলে ফিরিয়ে নেয় নি চোখ

বনান্তের সদ্যফোটা ফুল ।
রক্তজবা, কদম, বকুল
— সবাই দিয়েছে ধরা
আষাঢ়ের বিকশিত গোপন কেশরে ।
তারপর উত্তীর্ণ কৈশোরে একদিন
নগরে প্রবেশ করেছে আমার নৌকো ।
সময়ের অগ্নিকুণ্ডে বসে, দুরন্ত যৌবন
বাজি রেখে রচনা করেছি কাব্য,
স্বপ্নকে দিয়েছি মুক্তি ।

অস্থিমজ্জারক্তবীর্য ঢেলে
শব্দ ছেনে গড়েছি প্রতিমা সুন্দরের ।
তার আদল অনেকটাই মিলেছে
আমার গায়ের সঙ্গে । সে হয়নি
ছলনাময়ী নগরনটিনী, উর্বশীর মতো ।
তার কোথাও পড়েছে রবীন্দ্রনাথের
গীতিকবিতার ধ্যানমৌন ছায়া,
কোথাও নজরুলের বিদ্রোহের
দীপ্তি পেয়েছে প্রকাশ, কোথাও বা
সুকান্তের শ্রেণীঘৃণা পেয়েছে প্রাধান্য ।
প্রতারক সুন্দরের সংজ্ঞার নিগড়ে
আবদ্ধ হয়নি তার রূপ ।
জীবনের অনুগত করেছি শিল্পকে,
কল্পনার চেয়ে বাস্তবকে দিয়েছি মর্যাদা ।
গোলাপের চেয়ে কাঁটাকে এঁকেছি বড় করে,

শোষণের হিংস্রতার কালি দিয়েছি মাখিয়ে
সুন্দরের মুখের লাবণ্যে।
সুপুষ্ট স্তনের সাথে জোড়াবেঁধে দিয়েছি
অপুষ্ট স্তন, অক্ষরের যথেচ্ছ খোঁচায়
দিই নি ঘুচিয়ে পার্থক্যের সীমা।
সামাজিক সত্যকেই বলেছি সুন্দর।

দা ভিঞ্চির মোনালিসা সে হয়নি বলে
আমার আক্ষেপে নেই কোনো।
কাশবনের সেই কৃষক কন্যার
গোপন ব্যথার একটি কণাও যদি
প্রতিফলিত হয়ে থাকে
আমার কাব্যের প্রতিমায়,
যদি তার বিপুল ঘৃণার একটি স্ফুলিঙ্গও
প্রজ্বলিত হয়ে থাকে আমার ঘৃণায়,
যদি তার গোপন স্বপ্নের একটি পাপড়িও
প্রস্ফুটিত হয়ে থাকে আমার ভালোবাসায়,
জানি, একদিন তোমাদের প্রেমে, প্রশংসায়
অভিষিক্ত হবে আমার কবিতা,
ধন্য হবে সাতই আষাঢ়।

আপাতত আষাঢ়ের নীরব নির্ঝরে
জ্বলুক আমার জন্মদিনের একলা শিখা।

লেনিন ম্যুসুলিয়াম

আমার চক্ষুদ্বয়কে বলি 'প্রসারিত হও, অধীর হয়ো না,
স্থির হয়ে দেখো, প্রাণ ভরে দেখো ; এই তো লেনিন।

একদিন সিদ্ধিদাতা গণেশের ছবির উপরে যাঁর ছবি
দেখেছিলে কল্পলোকে অতি দূর নক্ষত্রের মতো,
আজ সেই নক্ষত্রের আলো লুটিয়ে পড়েছে এসে
তোমার দু'চোখে। যার মুখ হৃদয়ে সতত
বহন করেছো তুমি গভীর বিশ্বাসে,

আজ তাঁর মুখোমুখি এসে সবচেয়ে নিঃশব্দে দাঁড়াও।
কাঁপে না চোখের পাতা, শান্ত হও, শান্ত হও, সখা।
ভুলে যাও তুমি কোথা থেকে এলে,

ভুলে যাও তুমি কত দূর থেকে এলে,
মনে করো এই বিপ্লবীর বিপুল জীবনে
আদ্যন্ত জড়িয়ে ছিলে তুমি।

মনে করো তোমার শরীর এক
আশ্চর্য সুন্দর কাসকেট, তার অভ্যন্তরে
শুয়ে আছে জীবন্ত লেনিন,
যেন মাতৃগর্ভে প্রাণবন্ত শিশু।

হে আমার চোখে, অধীর হয়ো না, দেখো :
এরচে' সুন্দর দৃশ্য, এর চেয়ে নয়ন-ভোলানো
কোনো ছবি পৃথিবীতে আর নেই!
হে অনভ্যস্ত পা আমার, স্থির হও,
বোকামি করো না, চোখের নির্দেশ মেনে চলো।
ধীরে, খুব ধীরে ধীরে হাঁটো, যেন না ফুরিয়ে যায় পথ

যেন না হারিয়ে যায় এই লেনিন-প্লাবিত শোভা
তোমার পশ্চাতে। বলো, আমি কী করবো ?
আমার চোখ চলছে না ...... আমার পা চলছে না,
আমি অনেক দূরের পথ পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছি,
কিছুক্ষণ আমাকে দাঁড়াতে দাও, বন্ধু।
আরো কিছুক্ষণ আমাকে দেখতে দাও তাঁকে।

ক্রেমলিন-ফটক আগলে অনন্ত সুপ্তির মাঝে
তিনি শুয়ে আছেন, যেন ধ্যানমগ্ন বাল্মীকি আমার ;
স্তম্ভিত সময় মাথা নত করে কুর্নিশ করছে তাঁকে।
তিনি ভাবছেন, ভাবছেন, আর ভাবছেন।
তাঁর স্ফুরিত মেধার মুখ উদ্ভাসিত আশার আলোয়,
না-বলা কথায় স্পন্দমান, যেন সেই অনির্বাণ
দীপশিখা তিনি, অন্ধকার রাত্রি যার আলোর কাঙাল।

সিন্ধুমাতা

আদিতে সমুদ্র ছিল বড় বেশী নিঃসঙ্গ একাকী।
হাঙর, তিমির দল কিংবা সামুদ্রিক মাছের দঙ্গল
তখনো আসে নি। হিনছড়ি কিংবা আদিনাথের মন্দির
তখন ছিল না। ইঞ্জিনচালিত নৌকো, জেলের সাম্পান
অথবা দিগন্ত চেরা বিদ্যুচ্চমকে দৃশ্যমান
কোনো জাহাজের ছবি তখন কল্পনাতীত।
ফুঁসে-ওঠা সমুদ্রের ঢেউ ফেনা মাখিয়া ডানায়
সীগাল পাখিরা তখন অঙ্গের জ্বালা মিটাতে শিখে নি।
সে অনেক আগের কাহিনী।

উপরে আকাশে, হয়তো সে নীল নয় আজকে মতো,
হয়তো সে ছিল বিচিত্র বর্ণের ডোরাকাটা চিত্রল শামুক।
নিচে মাটি, হয়তো সে মাটি নয় আজকের মতো,
ছিল রুক্ষ লাল কঠিন পাথর। মাঝখানে জল,
শুধু জল, শুধু জল অবিরল।
আকাশের টলমল চোখ থেকে খসে-পড়া যেন স্বর্গসুধা।
বায়ুস্তর ছিন্ন করে ঝরে পড়া জলবিন্দুখানি
আজ বড় বেশি জলে মিশে গেছে,
ওকে খুঁজে পাওয়া আজকে কঠিন।

তবু আমি যতবার সমুদ্রের কাছে যাই
ঢেউএর ওপরে পাই, যখন সে জাগ্রত হয়,
নড়ে ওঠে আমার আত্মা।
তখন হঠাৎ মনে পড়ে যায়, এইসব নৈশোত্থিত
নুড়ির মেলায় একদিন আমিও ছিলাম।
বালিতে আশ্রয় খুঁজে এই যে নিরক্ত জেলী ফিস
জোয়ারের অপেক্ষায় পড়ে আছে তটরেখাজুড়ে,
তার প্রতীক্ষার মতো কাল গুণে জাগ্রত শৈবালদলে
ঢেউয়ের ফেনায় মিশে একদিন আমিও ছিলাম।

হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর, হে মোর জননী,
তুমি বলে দাও তোমার সজল গর্ভে কীরূপে ছিলাম?

সে কি নুড়ি ? শৈবাল ? পাথর ? নাকি ঢেউ ?
প্রাণহীন জীবনের সেই দীর্ঘ দিনরাত্রিগুলি পাড়ি দিয়ে
প্রথম যেদিন প্রাণের উদ্ভবে তুমি হলে গর্ভবতী-;
সেদিনের কোনো স্মৃতি পড়ে না কি মনে ?
কোনো চিহ্ন, কোনো শব্দ, কোনো অনুভূতি
পড়ে না কি মনে ? জাগে না কি কোনো শিহরণ

যখন তোমার বুকে আমি এসে রৌদ্রতপ্ত মুখখানি রাখি,
মাতৃ-সম্বোধনে আবার তোমাকে ডাকি, মা ।
আমি তো আসি না ছেড়ে প্রিয়তম সেই জন্মস্থল,
তুমিই দিয়েছো খুলে দ্বার,
দিয়েছো পৃথিবী জুড়ে সহজমুক্তির অধিকার ।
কেন তবে পুনর্বার জননীর ব্যগ্রবাহু মেলে
আমাকে জড়াবে বলে ছুটে আসো ধেয়ে ?
ফিরে যাও হে তরঙ্গ, তৃষিত জলধি, সিন্ধুমাতা-;
আমি ভালো আছি, নতুন আশ্রয়ে পেয়ে সুখে আছি
মৃত্তিকার বুকে । বিরহের তীব্র শোক নিয়ে
তুমি ছুটে যাও যেখানে তোমার সাধ,
আমাকে থাকতে দাও আমার মতন।
আমি মাঝে মাঝে অবসরমতো এসে
তোমার বিরহমূর্তি দেখে যাবো, শুনে যাবো
তোমার বিরতিহীন করুণ কান্নার শোঁ-শোঁ ধ্বনি ।
মাঝে মাঝে এসে তোমার সৈকতজুড়ে লিখে যাবো নাম,
যদিও পলকে তুমি ত্রস্তহাতে সেই নাম
মুহূর্তেই মুছে দেবে জানি ।

আমার কবিতা, মুক্ত প্যালেস্টাইন

হয়তো আমার কবিতা
তোমাদের চূড়ান্ত বিজয়ের সেই প্রত্যাশিত
মুহূর্তকে ছুঁতে চেয়েছিল ;
এতদিন তাই সে আসে নি ।

হয়তো আমার কবিতা
তোমাদের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জীবনের অন্তর্হিত
আনন্দকে ছুঁতে চেয়েছিল ;
এতদিন তাই সে আসে নি ।
হয়তো আমাদের কবিতা
তোমাদের ঘরে ফেরা উৎফুল্ল রাত্রির
আবেগের সাথী হতে চেয়েছিল ;
এতদিন তাই সে আসেনি ।
এতদিন সে ছিল শুধুই
তোমাদের অন্তহীন যাযাবর-যাতনার
একজন আহত দর্শক ।

হয়তো আমার কবিতা
বৃন্তচ্যুত পুষ্পের অব্যক্ত চাহনির সাথে
তোমাদের শরণার্থী মুখশ্রীকে
চায় নি মেলাতে ।

হয়তো সে ভেবেছিল তোমাদের ঘরে ফেরা
হাসি মুখগুলোকে স্বগৃহে স্বাগত জানাবে ;
এতদিন তাই সে আসে নি ।

হয়তো সে দেখতে চেয়েছিল
যুদ্ধশেষে ফিরে পাওয়া তোমাদের
মুক্ত প্যালেষ্টাইন ।

হয়তো সে উৎকর্ণ ছিল
নবজাতকের সাহসী কান্নার জন্য,

পূর্ব-পুরুষের মতো যে ভূমিষ্ঠ হবে
তার জন্মভূমির নিজস্ব মাটিতে ।

হয়তো আমার কবিতা
যুদ্ধ, মৃত্যু আর অন্তহীন রক্তপাত শেষে
চেয়েছিল অনন্ত শান্তির সরোবরে
প্রেমিক পদ্মের মতো সুগন্ধ ছড়িয়ে ফুটতে ।

হায়, যারা তা হতে দেয়নি,
যারা ভূলুণ্ঠিত করেছে আমার কবিতার
এই নিষ্পাপ স্বপ্নকে, যারা আমার
কোমল হৃদয়ের বৃন্ত থেকে ছিনিয়ে এনেছে
এই পাথরকঠিন পঙ্‌ক্তিমালা,
আমার ঘৃণায় যেন লেখা হয় তাদের বিনাশ,
যেন সাঙ্গ হয় অসুরের পালা ......।

একজন কবির সাক্ষাৎকার

: আচ্ছা, এককথায় কবিতা বলতে আপনি কী বোঝেন ?
—মানুষ ।
: আপনার কবিতায় রাজনীতির ব্যবহার খুব বেশী, মনে হয়
শিল্পের ব্যাপারটাকে আপনি খুব একটা, —এর কারণ কী ?
—মানুষ ।
: স্বর্গ, নরক ; —এসব বিষয়ে আপনার চিন্তাভাবনা জানতে
ইচ্ছে করে । একটু সহজ করে বুঝিয়ে বলবেন কি ?
—খুব সহজ করে বললে বলতে হবে, মানুষ ।
: মানুষের মৃত্যু হলে পরে, কিছু ভেবেছেন কি ?
—হ্যাঁ, ভেবেছি, তারপরও মানুষ।
:সব প্রশ্নের উত্তরই যদি মানুষ, তাহলে এবার বলুন,
মানুষ বলতে আপনি কী বোঝেন ?
—সমাজবদ্ধ শ্রমজীবী মানুষ ।
: তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো শেষ-পর্যন্ত ?
—দাঁড়ালো না, চলতে থাকলো ।
: মানলাম চলতে থাকলো, কিন্তু কে মানুষকে দিলো তার এই

অন্তহীন চলার গতি ? সে কি কোনো পরম শক্তি নয় ?
—হ্যাঁ, মানুষ এক পরম শক্তিই তো। ঠিকই বলেছেন।
: তার মানে, আপনি বলতে চান, এই সুন্দর পৃথিবী, এই মহাশূন্যমুগ্ধসৌরলোক, এই মৃত্তিকা, এই আকাশ, বাতাস- এগুলো সৃষ্টি করেছে মানুষ ?
—হ্যাঁ, মানুষ।
: বলুন, কীভাবে ?
—সন্তান যেভাবে সৃষ্টি করে তার মাতাকে, পিতাকে।

আমরা যাবো না

এখনো দুধের দাঁত পড়েনি, এরই মধ্যে
আইয়ুব খানের দাঁত দেখাচ্ছো ?
ভাবছো এতেই চলে যাবো ?
না, চলে যাবার জন্য আমরা আসিনি।
আমরা পুঁজিবাদের পথের কাঁটা,
আমরা রক্তচোষা জোঁকের মুখে থুথু,
আমরা যাবো না।

এই তো শোষণের পথ আগলে
আমরা বসলাম, দেখি কী করতে পারো।
কাঁদানে-গ্যাস ছুঁড়বে ? ছোঁড়ো।
এমনিতেই লাল হয়ে আছে
আমাদের চোখ, কাঁদানে-গ্যাসে
সে আর কত লাল হবে ?
গুলি চালাবে ? চালাও না।
আমরা অনেকবার মরেছি,
আবার মরবো।
আমাদের তো অস্ত্র নেই,
মৃত্যুই আমাদের অস্ত্র।
আমরা সশস্ত্র হবো অজস্র-মৃত্যুতে।
তবু আমরা যাবো না।

আমরা টিপু পাগলার আল্লাহ্‌র জমি
আমরা তীতুমীরের বাঁশের কেল্লা,
আমরা সূর্যসেনের বীর চট্টলা ;
আমরা যাবো না।

আমরা টংক-বিদ্রোহের নিহত হাজং
সুরেন্দ্র, রহিম, রাসমণি,
আমরা নাচোলের ইলা মিত্র, মাতলা সর্দার ।
আমরা যাবো না ।

আমরা বায়ান্নর রফিক-সালাম-বরকত ।
আমরা একাত্তরের তিরিশ লক্ষ,
আমরা শেখ মুজিবের শেষ দীর্ঘশ্বাস ।
আমরা যাবো না ।

আমরা ভূমিহীন ক্ষেত মজুরের ক্ষুধা,
আমরা ইতিহাস-খ্যাত দুনিয়ার মজদুর ।
আমরা কাজ না-পাওয়া বেকার যৌবন,
আমরা বেশ্যাপল্লীর আনন্দকুসুম,
আমরা ধর্ষিতা মনুবালা, নিহত দীপন ।
আমরা যাবো না ।

আমরা বন্ধনহারা কুমারীর বেণী
তন্বীনয়নে বহ্নি;
আমরা অগ্নির মুখে প্রতিবাদী লোহা
লাল টকটকে রক্ত ।
আমরা নাম না-জানা গায়েবী শহীদ ।
আমরা যাবো না ।

আমরা ভিয়েতনামের দিয়েন বিয়েন ফু,
আমরা সাব্‌রা শাতিলার বীর ফিলিস্তিনী,
আমরা ষ্ট্যালিনগ্রাডে হিটলারের কবর খুঁড়েছি,
আমরা দুনিয়া কাঁপানো দশদিন ।
আমরা যাবো না ।

আমরা কেন যাবো ?
কেন যাবো ?
কেন ?
আমরা ছিলাম,
আমরা আছি,
আমরা থাকবো ।

ইস্ক্রা

১
সংগ্রামই সুন্দর
সংগ্রাম সত্য ;
এ-ছাড়া আর যা
সবই ভুল তত্ত্ব ।

২
মেঘ দেয় বৃষ্টি
মাটি দেয় শস্য
পুড়ে-যাওয়া কাঠ
দেয় শুধু ভস্ম ।

৩
কোকিল প্রচার করে বসন্তের গান
কবি দেন সামাজিক সত্যের সন্ধান ।

৪
মার্ক্স, এঙ্গেলস্, লেনিন .....
ওঁরা আসছেন ;
দয়া করে পথ ছেড়ে দিন ।

৫
কোনোদিন শোষকেরা
হয়তো বদান্য হতে পারে ;
—এরকম সাধু কামনায়
দিন যায় ভাবুক কবির ।
জানে না সে, এই নীতি
অবাস্তব, অচল, স্থবির ।

৬
শুন হ শ্রমিক ভাই
সবার উপরে শ্রমিক সত্য
তাহার উপরে নাই ।

৭

বড়ো প্রয়োজন সামনে এসেছে
ছোটো প্রয়োজন ছাড়তে হবে।
জীবন হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র
ভুল করলে হারতে হবে।

৮

যে নদী সাগরে মেশে তার মৃত্যু নেই,
যে-কবি মিশতে পারে জনতা সাগরে,
তার ভাগ্য ঐ সমুদ্রমুখী নদীর মতই।

৯

পথিক বিশ্রাম করে দেখে
গর্ব করে শাল্মলীর ছায়া,
বৃক্ষ যেন কিছু নয়, সে-ই সব।
রৌদ্র বলে : 'দূর হ বেহায়া।'

১০

দৃষ্টি যদি অন্ধ থাকে সমাজের দিকে
লাভ নেই তার নামাজে, আহ্নিকে।

১১

কুসুমে আবৃত নয় মহত্বের পথ,
দুর্গম পথেই চলে মহত্বের রথ।

১২

প্রাসাদে, কুটিরে — মানুষেরা ভিন্ন চিন্তা করে।

১৩

যারা জীবনকে দেখে ধর্মের দূরবীণে,
জীবন তাদের কাছে অন্ধের দেখা হাতি।
যারা জীবনকে দেখে জীবনের দূরবীণে,
তারাই কিছুটা জীবনের মুখ চেনে।

১৪
জীবন মাতাল অশ্ব ।
কত পণ্ডিত, কত মহাজন,
কত মহাবীর, কত সন্ত-ঋষি
ছিট্‌কে পড়েছে তার পিঠ থেকে —।
কুয়োর ব্যাঙ, তুমি কে হে বাপু ?

১৫
সূর্য হলো অগ্নি, জীবন হাভানা চুরুট;
আমি সে চুরুট জ্বালি সূর্যের আগুনে ।
চাঁদ হলো মহুয়ার মদ,
জীবন মদের গ্লাস—পাত্র ভেবে তাতে
আমি মদ্যপান করি পূর্ণিমার রাতে ।

১৬
লও তুমি যত পারো শাস্ত্রের সন্ধানে,
হও তুমি পৃথিবীর পণ্ডিত প্রধান ।
মানুষের প্রতি যদি প্রেম নাহি রয়,
যত পড়ো, যত জানো কিছু কিছু নয় ।

১৭
ধনের আনন্দ আছে জানি
তার মধ্যে আছে রেষারেষি,
জ্ঞানের আনন্দ অমলিন
তার মূল্য লক্ষগুণ বেশী ।

১৮
সময় হচ্ছে সমাজের সম্পদ,
সকলের তাতে সঙ্গত অধিকার।

১৯
ক্ষুদ্রাস্বার্থসুখমত্ত মানবের আত্মা পরাধীন,
তার চিত্ত নিত্যনব রিপুর অধীন।
পরার্থে অক্ষয় সুখ, অন্বেষণে নাহি পরাজয়,

সেই সুখ চিরস্থায়ী, চির-জ্যোতির্ময়।

২০

অস্ত্রে বিকল্প নয় সমালোচনার অস্ত্র,
প্রয়োজন আছে, এই দুটোরই।
তত্ত্ব পারে না পথের পাথর সরাতে,
পাথর সরাতে পারে পাথরই।
তবে কিনা তত্ত্ব সে-ও ঢের শক্তি ধরে,
যদি তা পৌঁছুতে পারে মানুষের মনের ভিতরে।

২১

আছেন অনেক দার্শনিক,
আছে অনেক দর্শনও ;
জগৎ নিয়ে আছে তাদের
নানা ব্যাখ্যা বর্ষণও ।
কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে গিয়ে,
জগৎটাকে বদল করা নিয়ে ।

২২

প্রেমকে তুমি স্বর্গীয় ভাবো কেন ?
কেননা ওটা তোমার মাঝেও আছে ।
ঈশ্বরকে তুমি ভাবছো কেন জ্ঞানী ?
কেন না জ্ঞান তোমার মাঝেও আছে ।
তুমি তাঁকে কেন ভাবছো ন্যায়বান. ?
কেননা ন্যায় তোমার মাঝেও আছে ।
তাইতো আমি বলি নিরন্তর :
মানবরূপেই রঞ্জিত ঈশ্বর ।

২৩

শুধুই নিজের জন্য কাজ করে কেউ যদি,
হলে সে হতেও পারে বিখ্যাত পণ্ডিত,
সিদ্ধসন্ত মহাঋষি, চমৎকার কবি ;
—কিন্তু বলি শোনো, যতই পণ্ডিত হোক,
পূর্ণ মানব সে হবে না কখনো ।

২৪
পথ একটাই, অপথের নেই অন্ত,
একটাই জিভ্ — মুখে বত্রিশ দন্ত ।

২৫
ক্ষুদ্রই শুধু নয় বৃহতের অংশ
বৃহৎও অংশ ক্ষুদ্রের ।
শূদ্রই শুধু পায় নি আর্যরক্ত,
আর্যও পেয়েছে শূদ্রের ।

২৬
আমরা কেউ-ই ফেরেশতা নই,
ভুল তো হবেই ।
কিছুই করে না যে, ভুল করে না
শুধু সে-ই।

২৭
ঘুমের মানুষ জানে না যে ভোরের পাখি গায় কী ।
কালের যাত্রার ধ্বনি কালায় শুনতে পায় কি ?

২৮
মগজের জ্ঞান বিকাশমান বস্তুর প্রতিফল,
সমাজের জ্ঞান প্রচলিত অর্থনীতির ফসল।
মার্কসের এই কীর্তি বৈজ্ঞানিক চিন্তায় সৃজিত,
'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' নামে সে জগতবিদিত ।

২৯
হন যদি কোনো মহান লেখক তিনি,
তবে নিশ্চয় তাঁর রচনায় থাকবে বিদ্যমান
অন্তত কিছু বিপ্লবী উপাদান ।

৩০
মার্কসবাদ কেন বিশ্বজনীন মূর্তি ধরেছে এতো ?
যেহেতু সে তার বিগতদিনের সকল সুকৃতিকে

অবহেলা করে যায় নি দু'পায়ে দলে । বরং উল্টো,
অতীতের কৃতি আত্তীকরণ করেছে নিজের মতো ।

৩১
মজুরের শ্রম পণ্য করেছে পুঁজি,
মুদ্রা সেজেছে পুঁজির দালালতুল্য ।
দিনের কিছুটা খাটে বিনা মজুরিতে ;
তৈরী করতে মুনাফা, বাড়তি-মূল্য ।
এই হলো সেই 'বাড়তি মূল্য' তত্ত্ব,
মার্কসের আগে চাপা ছিল সেই সত্য ।

৩২
উৎপাদন সম্পর্ক যখন পরিণত শৃঙ্খলে,
উৎপাদনের শক্তি তখন
সে-সম্পর্কের বদলে
উন্নত সম্পর্কে গড়ে ; তাকেই বলে বিপ্লব ।

৩৩
সুখ মানে সংগ্রাম
প্রেম সে-ও তাই;
সংগ্রাম ছাড়া জীবনের
অন্য মানে নাই ।

৩৪
ঘাসের ডগাকে বলে রাতের শিশির :
'আমরা দু'জনে মিলে এসো বাঁধি নীড় ।'
উত্তরে ঘাসের ডগা শিশিরকে বলে :
'গগণে উঠিলে সূর্য যাবে না তো চলে ।'

৩৫
সংসার সমুদ্রমাঝে
আছে সুধা, আছে বিষ ।
তোমাদের সুধাভাগ্য
হোক অহর্নিশ ।

৩৬
অদর্শনে হ্রাস পায় প্রীতি
অভাবে অভ্যস্ত হয় মন ।
দূরদেশে প্রিয়-অন্তর্হিতি
হয় ক্ষণ-দুঃখের কারণ ।

৩৭
মরাকাঠে আগুন, জেতাকাঠে ফাগুন ।

৩৮
গোটা বিশ্বটাও যথেষ্ট নয়
জীবিতের কাছে;
মৃতের জন্য চাই বড়জোর
সাড়ে তিন হাত মাটি ।

৩৯
কে বড় ? আঁধার, না আলো ?
এই নিয়ে দুই মুর্খ বিতর্কে দাঁড়ালো ।
সূর্য থেকে আলো আসে, আঁধার কোত্থেকে ?
আঁধার স্বয়ম্ভু, কোনো সূর্য নেই তার,
বাস্তব প্রমাণে জয়ী হইল আঁধার ।

৪০
কে কাকে করেছে সৃষ্টি—
এই নিয়ে তর্ক শুরু হলে
গরিবের হার হলো তর্কশাস্ত্রে
ধনিকের নৈপণ্যের বলে ।

৪১
আকাশের মেঘ বলে বিজলিকে দেখে :
'কোথায় লুকিয়েছিল এমন সুন্দর ?'
চকিত বিদ্যুত হানি তখন কৌতুকে
বিজলি লুকায় মুখ মেঘের ভিতর ।

৪২

সূর্য তো অস্ত যায় না,
পৃথিবী ফিরিয়ে নেয় মুখ ।
আমরা বলি অস্ত গেছে সূর্য ।
সত্য সে-ও সূর্যের মতন,
আপন ঔজ্জ্বল্য নিয়ে আছে স্থির ।
আমরাই সত্য থেকে মাঝে মাঝে
ফিরিয়ে নিই মুখ ।

৪৩

সহে না সহে না আর
সম্পদের মুর্খ বাহাদুরি,
সম্পদ মানেই হলো চুরি ।

৪৪

প্রভুর জুতো দিচ্ছ প্রভুর
পায়ের মাপে বানিয়ে ।
আমায় বলছো জুতোর মাপে
তৈরী করতে পা ।

৪৫

বিশাল সমুদ্র, অরণ্য, পর্বতমালা,
অন্তহীন বিশাল আকাশ ;
তার চেয়ে শতগুণ সুবিশাল মন
মানব চৈতন্যে করে বাস ।

আমি বিষ খাচ্ছি অনন্ত

আমি বিষ খাচ্ছি অনন্ত, আমি বিষ খাচ্ছি ।
তুই একটু অপেক্ষা কর ।
বাইরে এমন চাঁদ, এমন জ্যোৎস্না,
তোর বুঝি ভালো লাগছে না ?

কী যে ভালো লাগছে আমার !
অনন্ত, তুই তার কিছুই জানলি নে,
কিচ্ছু জানলি নে । বড় সুখ, বড় ব্যথা ।
আচ্ছা, তুই যে ফিরতে বলিস্ কোথা যাবি ?
ঘর কোথা ? কোথা পাবি এরকম পল্লবিত
বিষের ভাণ্ডার ? কোথাও পাবি না ।

চলে যাস্ নে অনন্ত, শোন্, এই দ্যাখ্
আর মাত্র একটি গেলাস ....
আর মাত্র একটি চুমুক ।
এ-চুমুকে নেশা হবে, তারপর, তারপর,
তারপর আমরা দু'জনে মিলে ফিরে যাবো ।
সত্যি ফিরে যাবো ।

ঘরে বুঝি খুব শান্তি ? খু-ব ভালোবাসা ?
সেই ভালো, একটু তাড়াতাড়ি পা চালা, অনন্ত
একটু তাড়াতাড়ি চল্........ ।

আবার একটা ফুঁ দিয়ে দাও

আবার একটা ফুঁ দিয়ে দাও,
মাথার চুল মেঘের মতো উড়ুক ।
আবার একটা ফুঁ দিয়ে দাও,
স্বপ্নগুলো ছায়ার মতো ঘুরুক ।

আবার একটা ফুঁ দিয়ে দাও,
অটোমেটিক ঘড়ির মতো

জ্বলতে থাকি একা।

আবার একটা ফুঁ দিয়ে দাও,
অন্ধকারের সলতে হয়ে
জ্বলতে থাকি একা ।
আবার একটা ফুঁ দিয়ে দাও,
ফুসফুসে পাই হাওয়া ।

১৬-৪-৮৪

চতুর্দিকে বইছে যখন বৈরী হাওয়া
তোমার কাছেই তখন আমার ফিরে যাওয়া ।
আকাশজুড়ে ঝড়ো বৃষ্টি, সূর্য উধাও,
তুমিও যদি এক পলকের দেখা না দাও
দৃষ্টি আমার আটকাবে কোন্ দৃশ্য পানে ?
বসন্ত কি ভস্ম হবে অগ্নিবাণে ?

চতুর্দিকে বইছে যখন বৈরী হাওয়া
তোমার কাছেই তখন আমার প্রবল চাওয়া ।
সংসারেতে ঘটছে যখন কেবল ক্ষতি
আমি আবার হাত পেতেছি তোমার প্রতি ।

দীনভিখারির আছে তবু ভিক্ষাপাত্র,
আমার শুধু কুণ্ঠিত দুই হস্ত মাত্র ।
কুণ্ঠিত সেই দু'হাত দিয়ে তোমার দু'টি
চরণ ধরার লজ্জাতে আজ আঁতকে উঠি ।

দৈন্য কত আকাশ ছোঁয়া হতে পারে,
বুঝি যখন দাঁড়াই এসে তোমার দ্বারে ।
অহংকারে ঢাকে না সেই গ্লানির কণা,
বরং তাতেই বাড়ে আত্মপ্রবঞ্চনা ।

ক্ষুদ্রতাকে আড়াল করি নাই সে সাধ্য,
ক্ষুদ্র চিরকালই জানি বৃহৎ বাধ্য ।

তোমার কাছে ফিরে এসে প্রত্যহ তাই
অপমানের পরেও অনেক আনন্দ পাই ।

তুমি চাও না সে আনন্দের অংশ নিতে,
পোড়াতে চাও আমাকে তার দংশনাতে ।
হে ভূজঙ্গী বধূ আমার, প্রিয় সর্প,
দংশনেও কি হবে না লীন তোমার দর্প ?

এই যে এত বাগানজুড়ে ফুল ফুটেছে,
এই যে এত বাতাস নিয়ে ঘ্রাণ ছুটেছে,
এর সবই কি ব্যর্থ হবে অভিমানে ?
পুষ্পবীথি পোড়াবে কি অগ্নিবাণে ?

এই যে আমি তোমার পানে হাত পেতেছি,
এই যে আমি তোমার গানে আজ মেতেছি,
এই সবই কি মিথ্যে ? শুধুই প্রতারণা ?

অবিশ্বাসে বাড়াই কেন নিজের ক্ষতি,
আমি আমার আস্থা রাখি প্রেমের প্রতি ।

১৭-৪-৮৪

কে যেন হঠাৎ দরজার কাছে এসে
পাগলের মতো ডেকেছিল ভালোবেসে :
'ওরে ওঠ্, সর্বনাশ হয়ে গেছে তোর।'
তবুও আমার ভাঙেনি ঘুমের ঘোর ।

আজ মনে পড়ে ঠিক, তাই তো, তাই তো -
আমি সে ডাকের উত্তর দিই নাই তো ।
সর্বনাশের রেফের দ্বিত্ব ধ্বনি
শুনিয়া পরান উঠেছিল উন্মনি :
'ওরে ওঠ্, সর্বনাশ হয়ে গেছে তোর ।'
তবুও আমার ভাঙে নি ঘুমের ঘোর ।

তখন রাত্রি সুবেহ্ সাদেকের কোলে
ভোরের মাধবীলতারা আকাশে দোলে।
কে যেন হঠাৎ পাগলের মতো এসে
ডাক দিয়েছিল অদ্ভুত ভালোবেসে :
'ওরে ওঠ্, সর্বনাশ হয়ে গেছে তোর।'
তবুও আমার কাটে নি ঘুমের ঘোর।

মসজিদ ছিল আজান ধ্বনিতে জাগা,
নিদ্রিত আঁখি, ওষ্ঠ অধরে লাগা।
অর্ধেক ঘুমে, অর্ধেক জাগরণে
কার আহ্বান পশেছিল যেন মনে :
'ওরে ওঠ্, সর্বনাশ হয়ে গেছে তোর।'
তবুও আমার কাটেনি ঘুমের ঘোর।

বিদ্যুৎবেগে ঘুরছিল কলপাখা,
বাইরে হাওয়ায় দুলছিল ফল শাখা।
বুকে বহমান ফল্গু স্রোতের নদী
শিয়রে দাঁড়িয়ে বলেছিল নিরবধি :
'ওরে ওঠ্, সর্বনাশ হয়ে গেছে তোর।'
তবুও আমার কাটেনি ঘুমের ঘোর।

গভীর আকাশে থাকে যে তারারা জেগে,
তাদের চোখেও ঘুম এসেছিল লেগে।
হঠাৎ তখন প্রলয়োত্থিত ঝড়ে
আমার বন্ধ দুয়ার উঠিল নড়ে :
'ওরে ওঠ্, সর্বনাশ হয়ে গেছে তোর।'
তখনো আমার কাটেনি ঘুমের ঘোর।
আজ মনে পড়ে ঠিক, তাই তো, তাই তো,
সেদিন ডাকের উত্তর দিই নাই তো।

সর্বনাশের ছন্দিত ঝংকার
ভাঙতে পারেনি যে কালনিদ্রা তার,
অবসান হলো তোমার মধুর ডাকে।

১০-৫-৮৪ / তিন

সদরঘাটে পৌঁছতেই শুরু হয়ে গেলো বৃষ্টি ।
ছোট ছোট ফোঁটা হলে নিয়ে নিতাম মাথায়,
কিন্তু বৃষ্টির ফোঁটাগুলি ছিল বেশ বড়-সড়ো ।
তাই, অগত্যা দৌড়ে এসে আশ্রয় নিলাম
এক পুরণো বইয়ের দোকানের তলায় ।
সচরাচর এসব দোকানে আজকাল ঢুকি না,
কিন্তু আগে একসময় অভ্যেস ছিল ।

বৃষ্টি থামবার কোনো লক্ষণ নেই দেখেই
চোখ ফেরালাম সাজানো বইয়ের পুটে ।
রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং মাসুদরানার পাশে
হঠাৎ দেখি আমার নিজের লেখা একখানা
কাব্যগ্রন্থ : 'কবিতা, অমীমাংসিত রমণী'।
বাহ্ বেশ মজার ব্যাপার তো ।
একবার ভাবলাম, দেখি একটু হাতে নিয়ে;
আবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো, থাক,
দোকানির মনে প্রত্যাশাভঙ্গের দুঃখ দেবো না ।

কিন্তু কৌতূহল বড়ো সংক্রামক ।
অজান্তেই হাত চলে গেলো বইয়ের দিকে।
পাতা উল্টাতেই রমণীর হস্তাক্ষরে
আমার চোখ গেলো আটকে ।
গোটা গোটা কাঁচা কালো কয়েকটি শব্দ
আমার বিকেলটাকেই দিলো বদলে :
'খোকা ভাই, আরও সুন্দর-
আরও ভালো হও।'
— মমতা ।

বৃষ্টিভেজা মনের মধ্যে নামটা গেঁথে গেলো
মার্বেলের ভিতরের রঙিন ফুলের মতো ।
আমার মনটা ভরে গেলো মমতায় ।
মনে হলো আমার কবিতার চেয়ে অনেক বেশী

সুন্দর মমতার এই প্রার্থনা। কী সুন্দর মমতার
এই চাওয়াটুকু। ভাবলাম, এরপরও কি খোকা
ভালো না হয়ে পারে ?

পরমুহূর্তেই মনে হলো, এ-বই দোকান এলো
কী করে, আর এখানে এলোই বা কেন ?
মমতার দেয়া এই উপহার, আহা, হতভাগা
খোকা বুঝি এর মূল্য বুঝলে না ?
না কি ঐ বই দু'জনের বিচ্ছেদের স্মৃতি ?
এ কি ভালোবেসে দেয়া মমতার শেষ উপহার ?
আমার কষ্ট হলো এসব কথা ভাবতে,
তবু ভাবলাম, ভাবলাম ভাবনার অভ্যাসে

বৈশাখের বৃষ্টি থেমে গেলো দ্রুত।
বইটিকে যথাস্থানে রেখে আমি পা বাড়ালাম
বাংলাবাজারের উদ্দেশ্যে।
কিন্তু মমতা চললো আমার সাথে সাথে,
যেন আমিই তার খুঁজে পাওয়া খোকা ভাই।
যেন এই বৃষ্টিস্নাত বিকেলবেলায়, আজ তার
সকল প্রার্থনা পৌঁছেছে যথাস্থানে।

২২-৫-৮৪ /এক

এখন আমার সবচেয়ে বেদনার গানগুলি লেখার সময়।
সমুদ্র আমার চোখের জল ফিরিয়ে দিয়েছে,
এখন আমার সামনে এক ক্রমঃপ্রসারিত মরুভূমি।
একদিন যে নবধারায় যুক্ত হয়েছিল আমার প্রবাহ —
এখন সে উৎসবিচ্ছিন্ন এক ক্ষীণস্রোতা নদী,
শুকিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় প্রহর গুণছে নিজের ভিতরে
এখন আমার সবচেয়ে বেদনার গানগুলি লেখার সময়।

একটু পরেই যে প্রদীপ নিভে যাবে আমি বসে আছি
তার শেষ শিখার প্রজ্জ্বলনের সামনে।
একদিন আমার বেসুরো কণ্ঠের তুচ্ছ গানগুলি যাকে
ঘরের বাইরে টেনে এনেছিল, আমার শ্রেষ্ঠ গানগুলিও

আজ তার দুয়ার থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।
যে বিহঙ্গীর ডাকে একদিন আমাদের নিদ্রা ভেঙেছিল,
আজ গান বন্ধ করেছে সেই পাখি।

আমি মৃত্যুকে অতিক্রম করতে চেয়েছিলাম, ভেবেছিলাম
প্রচণ্ড ভালোবাসায় মৃত্যুকে বদলে দেয়া সম্ভব।
আমি উচ্চকণ্ঠে জীবনের যে গান গেয়েছি, তার মধ্যে
কোথাও থেকে গিয়েছিল মারাত্মক ত্রুটি।
যে ক্ষমার উপরে আমি পা রেখেছিলাম, সে অপসৃত।
এখন আমার সবচেয়ে বেদনার গানগুলি লেখার সময়।

আমি জানি মানুষের জয় হবে, সে তো মৃত্তিকার মতো,
কিন্তু আমি সে-আনন্দের ভোজে অপাঙ্‌ক্তেয় রয়ে যাবো
আমি ভালোবাসার চোখ ভিজিয়েছি ঘৃণায়,
আমি তার মুখে ছড়িয়ে দিয়েছি বেদনার কালো ছায়া।

তোমার পতাকা আমি বইতে পারিনি, এই বাস্তব সত্যের
মধ্যে লুপ্ত হোক আমার অর্জিত সব মিথ্যে পরিচয়।

১৬-১০-৮৪

যদি মড়া পোড়াতে চাও, পোড়াবে,
খোলা আকাশের নিচে ফেলে রাখবে না।
তাকে আগুনের সিংহাসনে বসাও,
সে ইচ্ছেমতো পুড়ুক।
তোমার উপেক্ষা তাকে ঠেলে দিয়েছে
চিতার শিখার বাইরে।
তার মুখটা পুড়েছে বটে, কিন্তু হাত-পা
এখনো ঢের বাকি।
পোড়াবেই যদি তবে এত মায়া কোন ?
তাকে চিতার ভিতরে নিয়ে এসো,
তবেই না সে পুড়বে।

কষ্ট হলে মাটি খুঁড়ে কবরও দিতে পারো।

১০-২-৮৫

নিজের জলেই টলমল করে আঁখি,
তাই নিয়ে খুব বিব্রত হয়ে থাকি ।

চেষ্টা করেও রাখতে পারি না ধরে—
ভয় হয় আহা, এই বুঝি যায় পড়ে ।

এমনিই আছি নদীমাতৃক দেশে,
অশ্রুনদীর সংখ্যা বাড়াবো শেষে ?

আমার গঙ্গা আমার চোখেই থাক্
আসুক গ্রীষ্ম মাটি-ফাটা বৈশাখ।

দোষ নেই যদি তখন যায় সে ঝরে,
ততদিন তাকে রাখতেই হবে ধরে ।

সেই লক্ষ্যেই প্রস্তুতি করে সারা,
লুকিয়েছিলাম গোপন অশ্রুধারা।

কিন্তু কবির বিধি যদি হন বাম,
কিছুতে পূর্ণ কহয় না মনষ্কাম ।

মানুষ তো নয় চির-সংযমে সাধা,
তাই তো চোখের অশ্রু মানে না বাধা ।

আমার জলেই টলমল করে আঁখি,
তোমার চোখের অশ্রু কোথায় রাখি ?

নিরঞ্জনের পৃথিবী

পৃথিবী যে স্থির নয়, সে-কথা আমি আগেও জানতাম।
সূর্যকে কেন্দ্র করে মহাশূন্যের কক্ষপথে সে ঘুরছে ।
পৃথিবী হচ্ছে অন্ধকার ম্যাজিকমঞ্চে কালো সুতো দিয়ে
ঝুলিয়ে রাখা, উত্তর-দক্ষিণে চাপা এক কৃষ্ণ কমলালেবু ।
কালো সুতোটা চর্মচোখে দেখা যায় না, কিন্তু আছে ।

আমি যখন এই পৃথিবীর দিকে তাকাই, তখন হঠাৎ দেখি

ফলের দোকানের সুতো-বাঁধা আপেলের মতো পৃথিবী ঝুলছে ।
আমি পৃথিবীর মুখ দেখতে পাই । কখনো প্রসন্ন, কখনো বিষণ্ণ ।
পৃথিবী নিরঞ্জনের মতো । নিরঞ্জন আমার ছেলেবেলার বন্ধু ।
আমাদের বাড়ির পেছনের গভীর জঙ্গলে, শনিবারের সন্ধ্যায়,
বদ্যিরাজ গাছের উঁচুডালে নিরঞ্জন ফাঁসি দিয়েছিল ।
তার ঝুলন্ত লাশ আমরা আবিষ্কার করেছিলাম পরদিন ভোরে ।
দড়ি খুলে নামিয়ে না-আনা পর্যন্ত সে মহাশূন্যেপৃথিবীর মতো

ঝু
ল
ছি
ল।

পৃথিবী, মহাশূন্যের সেই অভিমানী পুত্র, নিরঞ্জন ।
পার্থক্য এই, নিরঞ্জনের দড়িটা তাকালেই দেখা যায়, কিন্তু
পৃথিবীর ফাঁসির দড়িটা অদৃশ্য ; তা দেখা যায় না চর্মচোখে ।
কিন্তু খুব গভীর-নিমগ্ন অন্তর্ভেদী চোখে তাকালে দেখা যায় ।

আমি যখন পৃথিবীর দিকে তাকাই, পৃথিবী নড়ে ওঠে ।
আমি নগ্নযুগলপায়ে আঁকড়ে ধরি পায়ের নিচের মাটি;
তখন পৃথিবী আমার পায়ে পৃথিবীর জুতো পরিয়ে দেয় ।

মানুষের বাসযোগ্য কি না, তা জরিপ করে দেখার জন্যই
আমি এসেছিলাম এই পৃথিবীতে ; মানুষ যেমন
বাসযোগ্যতা জরিপ করতে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যায় ।

প্রজ্বলন্ত দাউদাউ অগ্নিকুণ্ডের ভিতর থেকে আমি বেরিয়ে
এসেছিলাম লাল টক্‌টকে লৌহপিণ্ডের কমলালেবুর মতো।
দুর্ধর্ষ অভিযাত্রীর কৌতূহলী চোখ নিয়ে অতঃপর
আমি প্রদক্ষিণ করেছি পৃথিবী নামের এই ক্ষুদ্র-দ্বীপটিকে ।

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রহোদয়গণ, আপনাদের প্রিয় পৃথিবী
মোটামুটিভাবে বলতে পারি, আমার ভালোই লেগেছে ।
সে চির-নবীনা, শস্যশ্যামলা, উর্বরা এবং কামার্ত ।
কিন্তু সে বড় বেশী স্বার্থপর, অহংকারী, জেদী এবং আত্মমগ্ন ।
এর সতেজ সবুজ রঙটার কথা আমার বেশ মনে থাকবে ।

এতদ্‌সত্ত্বেও আপনাদের পৃথিবী আমার বাসযোগ্য মনে হয় নি ।
তাই, আমি যেখান থেকে এসেছিলাম, সেখানেই ফিরে যাচ্ছি ।

ফিরে যাবার আগে, নিরঞ্জনের অকথিত বেদনার কথা ভেবে
আমি পৃথিবীর ফাঁসির গিঁটটা একটু ঢিলা করে দিয়ে গেলাম,
যাতে আপনারা তার মুক্তমুখের কিছু প্রয়োজনীয় কথা
শুনতে পারেন, নানা কারণে যা সে কখনো বলতে পারে নি ।

আমি আবার আসবো, পৃথিবীর কোমল মৃত্তিকায় রেখে-যাওয়া
আমার ভালোবাসার পদচিহ্নের টানে । এখন বিদায় .... ।

ভালোবাসা আমাকেও বেশ ভুগিয়েছে

মাঝে-মধ্যে, হঠাৎ-সহসা কেন যে জানি না,
বুকের ভিতরে, খুব অভ্যন্তরে, গভীরে কোথাও,
যে-স্থানটির নাম আজও স্থির করে উঠতে
পারে নি মানুষ ; আর সুনির্দিষ্ট কোনো নাম
না থাকার জন্যই যে স্থানের রহস্যটুকু কখনো
ঘুচবার নয়—; অর্থাৎ কোনো অনির্দিষ্টকে
ধরবার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো শব্দ যেখানে
সবচেয়ে বেশি ব্যর্থ হয়, সেই চিররহস্যাবৃত,
চির অধরা মনের ভিতরে-
মাঝে-মধ্যে, হঠাৎ-সহসা কেন যে জানি না,
বুকের ভিতরে, খুব অভ্যন্তরে, গভীরে কোথাও,
আমি অনুভব করি এক অস্ফুট আবেগ— ।
যে-আবেগের নাম আজও স্থির করে উঠতে
পারেনি মানুষ, আর সুনির্দিষ্ট কোনো নাম
না থাকার জন্যই যে আবেগের রহস্যটুকু
কখনো ঘুচবার নয় ; অর্থাৎ কোনো অনির্দিষ্টকে
ধরবার ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট শব্দ যেখানে
সবচেয়ে বেশী ব্যর্থ হয়, সেই চিররহস্যাবৃত,
চির অধরা প্রেমের ভিতরে-
মাঝে মধ্যে, হঠাৎ সহসা কেন যে জানি না,
বুকের ভিতরে, খুবই অভ্যন্তরে, গভীরে কোথাও,

তুমি এসে জীবনের মূল ধরে নাড়া দিয়ে যাও ।
হয়তো সবার ক্ষেত্রে এরকমই হয়, ওটা
এমন কাব্য করে বলবার কথা নয় ।
আমিও মানি সেই সহজ, সরল সত্যটা।
তবু কেন কাব্য করে বলি? বলি এজন্য যে,
অন্য কিছুটা ব্যতিক্রমও হতে পারতো ।
কিন্তু হয়নি ।

ভালোবাসা আমাকেও বেশ ভুগিয়েছে ।

আফ্রিকার প্রেমের কবিতা

যে বয়সে পুরুষ ভালোবাসে নারীকে, সে বয়সে তুমি
ভালোবেসেছিলে তোমার মাতৃভূমি, দক্ষিণ আফ্রিকাকে
যে বয়সে পুরুষ প্রার্থনা করে প্রেয়সীর বরমাল্য,
সে বয়সে তোমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছে ফাঁসির রজ্জুতে ।
যে বয়সে পুরুষের গ্রীবা আকাঙ্ক্ষা করে
রমণীর কোমলবাহুর ব্যগ্র-মুগ্ধ আলিঙ্গন ;
সে বয়সে তোমাকে আলিঙ্গন করেছে
মৃত্যুর হিমশীতল বাহু।

তোমার কলম নিঃসৃত প্রতিটি পঙ্‌ক্তির জন্য
যখন তোমার প্রাপ্য ছিল প্রশংসার হীরকচুম্বন,
তখন তোমার প্রাপ্য হয়েছে মৃত্যুহীরক বিষ ।

তোমার কবিতা আমরা একটিও পড়িনি আগে,
কিন্তু যেদিন ওরা তোমাকে রাতের অন্ধকারে
ফাঁসিতে ঝোলালো -
তার পরদিন সারা পৃথিবীর ভোরের কাগজে
ছাপা হলো তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কবিতা ।
আমরা জানলাম, কী গভীরভাবেই না তুমি
ভালোবেসেছিলে তোমার প্রিয়তম মাতৃভমিকে ।
আমরা জানলাম, কালো আফ্রিকার
শ্বেত-শত্রুদের বিরুদ্ধে কী ঘৃণাই না ছিল
তোমার বুক জুড়ে, শোণিতে, হৃদয়ে ।

তুমি কবি, বেঞ্জামিন মোলয়েস, তুমি মৃত্যু দিয়ে
কবিতাকে বাঁচিয়ে দিয়েছো তার মৃত্যুদশা থেকে ।
বেঞ্জামিন মোলয়েস, তুমি এখন সারা-বিশ্বের কবি,
তোমার জন্মভূমি, দক্ষিণ আফ্রিকা এখন পৃথিবীর
তাবৎ-কবিদের শৃংখলিত মাতৃভূমি ।

কারাগারের ফটকে নেলসন ম্যাণ্ডেলার পত্নী যখন
তোমার শোকাতুরা মাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন,
তখন, মোলয়েস, তখন তোমার মায়ের পুত্রশোকদগ্ধ
বুকের উদ্দেশে পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি
ছুটে গিয়েছিল ; এবং মাথা নত করে ফিরে এসেছিল
লজ্জায়, তোমার সাহসের যোগ্য হয়ে উঠবে বলে,
তোমার ভালোবাসার যোগ্য হয়ে উঠবে বলে ।

আমরা কবিতাগুলি তোমার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাতে
আজ সারাদিন মাথা নত করে নীরবতা পালন করেছে ।
মধ্যরাতেও আমাকে কলম হাতে জাগিয়ে রেখেছো তুমি।
বেঞ্জামিন মোলয়েস, তুমি একটুও ভেবো না, তোমার অপূর্ণ
স্বপ্নসমূহ বুকে নিয়ে আমরা জেগে আছি এশিয়ায় —;
তুমি আফ্রিকার মাটিতে ঘুমাও ।

কাশবন ও আমার মা

আমার একটি ছোট্ট সুন্দর গ্রাম ছিল, তার নামটিও ছিল
ভারী সুন্দর, কাশতলা । মনে হয় একসময় কাশফুলের খুব
প্রাচুর্য ছিল ঐ গ্রামে । আমি কবিত্ব করে তার নাম পাল্টে
রেখেছিলাম কাশবন ; —ভালোবেসে প্রেমিক যেমন তার
প্রেমিকার নাম পাল্টে রাখে । সে-ই আমার প্রথম কবিতা ।

ঐ গ্রামটির জন্ম হয়েছিল আমাকে জন্ম দেবার জন্যে,
এ ছাড়া ঐ গ্রামের আর কোনো উল্লেখযোগ্য অর্থ নেই ।
প্রতিটি গ্রামই কাউকে না কাউকে জন্ম দিয়ে চলেছে,
সেদিক থেকে আমার গ্রামটি এমন কিছু করে নি যাতে
তাকে পাগলের মতো মাথায় তুলে নাচতে হবে শিবনৃত্য ।

তবু নবকবিত্বের উন্মত্ততায়, এই জীর্ণ-শীর্ণ দেহেও, আমি
আমার আদুরে গ্রামটিকে মাথায় নিয়ে বেশকিছুদিন নৃত্য
করেছি। যত ছোটই হোক, মেয়ে মানুষেরও ওজন আছে;
আর গাছগাছালি ভরা একটা সম্পূর্ণ গ্রাম, ভেবে দেখুন।
নগরবাসীরা আমার কাণ্ড দেখে মুচকি হেসেছে, তা হাসুক,
আমি তাদের সব উপহাস সহ্য করেছি প্রেমের জোরে।

কিন্তু আজকাল কী যে হয়েছে আমার। আমিও কেমন যেন
তাদের মতোই হয়ে যাচ্ছি। ভুলে যাচ্ছি আমার গ্রামটিকে,
আমাকে জন্ম দেবার জন্যেই একদিন যার জন্ম হয়েছিল।
মাথায় নিয়ে তো দূরের কথা, আজকাল কোমড় জড়িয়েও
আর নৃত্য করি না। আমাকে টেনেছে এই নগর নটিনী।
অথচ নিশ্চিত জানি কাশবন এখনো আমার অপেক্ষায় বসে
অনিদ্র প্রহর গোণে বেহুলার মতো। এই তার একমাত্র কাজ

এক-একবার ভাবি, যাবো। চলে যাবো। ফিরে যাবো ....।
কিন্তু যাওয়া হয় না। কেন হয় না? নানা কারণেই হয় না।
মা আমাকে জন্ম দিয়ে মরে গিয়েছিলেন মাকড়সার মতো,
তাঁকে ধন্যবাদ। কাশবন কেন যে আমার মায়ের মতো নয়।

লিপিষ্টিক

ট্যাকা কি গাছের গুডা?
নাকি গাঙের জলে ভাইস্যা আইছে?
এই খানকী মাগীর ঝি?
একটা টাকা কামাই করতে গিয়ে
আমার গুয়া দিয়া দম আয়ে আর যায়।
আর তুই পাঁচ ট্যাকা দিয়ে
ঠোঁট পালিশ কিনছস্ কারে ভুলাইতে?
ক্যা, আমি কি তরে চুমা খাই না?
এই তালুকদারের বেডি, বাপের জন্মে
পাঁচ ট্যাকার নুট দেখছস্?
যা, অহন রিকশা লইয়া বাইর,
আমি আর রিকশা বাইতে পারুম না।

বউটা ভীষণ ঘাবড়ে যায় ।
কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে এগোয় রিকশার দিকে :
'তয় আমারে রিকশা চালানি শিখাইয়া দেও ।'

রিকশাঅলা বউয়ের দিকে আচমকা তাকায়,
তার চোখ আটকে যায় বউয়ের পালিশ করা ঠোঁটে ।
বুকের মধ্যে হঠাৎ করে ঝলক দিয়ে ওঠে রক্ত ।
একটু আগেই যাকে তালাক দেবে ভেবেছিল :
'আয়, তরে রিকশা চালানি শিখাই', —বলে
সে তার সেই বউটাকে চুলের মুঠো ধরে
হ্যাঁচড়াতে-হ্যাঁচড়াতে টেনে নিয়ে যায়
আপন গুহার দিকে ।

ঘন্টখানেক ধরে বউকে সে রিকশা চালানি শেখায়।

বউ বলে : 'কী অহন রাগ পড়িছে ?'
রিকশাঅলা বউয়ের দিকে তাকায়,

চেনা বউটাকেও কেমন অচেনা মনে হয় ।
ভাবে, আহা, পাঁচ ট্যাকার লিপিষ্টিকেই অতো ।
বড়লোকদের মতো যদি সে বউটার পেছনে
আরো কিছু ট্যাকা ইনভেষ্ট করতে পারতো।

রমনা পার্কের হাওয়া খাওয়াবে বলে
সে তখন বউটাকে প্যাসিঞ্জার বানিয়ে নিয়ে
ছুটে যায় রমনা পার্কের দিকে ।

স্ববিরোধী

আমি জন্মেছিলাম এক বিষণ্ণ বর্ষায়
কিন্তু আমার প্রিয় ঋতু বসন্ত ।

আমি জন্মেছিলাম বৃষ্টিভরা আষাঢ় সকালে,
কিন্তু আমি ভালোবাসি চৈত্রের সন্ধ্যা ।

আমি জন্মেছিলাম দিনের শুরুতে,
কিন্তু ভালোবাসি নিঃশব্দ নির্জন মধ্যরাতে।

আমি জন্মেছিলাম ছায়াসুনিবিড় এক গ্রামে,
কিন্তু ভালোবাসি বৃক্ষহীন রৌদ্রদগ্ধ ঢাকা।

জন্মের সময় আমি খুব কেঁদেছিলাম,
কিন্তু এখন আমার সবকিছুতেই হাসি পায়।

আমি জন্মের প্রয়োজনে ছোট হয়েছিলাম,
এখন মৃত্যুর প্রয়োজনে বড় হচ্ছি।

যখন আমি বুকের পাঁজর খুলে দাঁড়াই

বুকে আমার আগুনে জ্বলে
দাউদাউ দাবানল।
যখন আমি বুকের পাঁজর
খুলে দাঁড়াই,
অথবা যেই পাঁজর খোলা
টক্‌টকে লাল চুল্লিটাতে
হৃদয় বাড়াই ;
তোমরা তখন জ্বলন্ত লাল
কয়লাগুলোর কাছে যেতে
ভয় কেন পাও ?

ছিল আমার কোমল হৃদয়
স্নিগ্ধশীতল ছায়ার মতো,
কিন্তু মাটি চাপা পড়ে
ক্রমশ সে কয়লা হলো
কেমন করে, কেউ জানে না।
সবাই বলে, সহ্য হয় না,
কবির হৃদয় এমন তপ্ত
হয় কী করে ?

আমি হাসি।
উটের যেমন বালুতে মুখ
তেমনি আমি অগ্নিদগ্ধ
হাতের দু'টি তালুতে মুখ

ঢেকে রাখি। বলি, আগুন,
জ্বলো, সখা জ্বলো, তোমার
দহণ আমি ভালোবাসি।

দূর থেকে তা দেখে
ভয়ে পালায় কে কে,
লাভ কি আমার
সে সব হিসাব রেখে ?
আমার মতো বক্ষে আগুন
যাদের বুকে আছে,
তারা ঠিকই সময় হলে
আসবে আমার কাছে।
সময় হলে তারা ঠিকই
গাইবে আমার জয়,
মানবে তারা আগুন ছাড়া
জীবন কিছু নয়।

তোমার চোখ এতো লাল কেন

আমি বলছি না ভালোবাসতেই হবে, আমি চাই
কেউ একজন আমার জন্য অপেক্ষা করুক,
শুধু ঘরের ভিতর থেকে দরোজা খুলে দেবার জন্য।
বাইরে থেকে দরোজা খুলতে খুলতে আমি এখন ক্লান্ত

আমি বলছি না ভালোবাসতেই হবে, আমি চাই
কেউ আমাকে খেতে দিক। আমি হাতপাখা নিয়ে
কাউকে আমার পাশে বসে থাকতে বলছি না,
আমি জানি, এই ইলেকট্রিকের যুগ
নারীকে মুক্তি দিয়েছে স্বামী-সেবার দায় থেকে।
আমি চাই কেউ একজন জিজ্ঞেস করুক :
আমার জল লাগবে কি না, নুন লাগবে কি না,
পাটশাক ভাজার সঙ্গে আরও একটা
তেলে ভাজা শুকনো মরিচ লাগবে কি না।
এঁটো বাসন, গেঞ্জি-রুমাল আমি নিজেই ধুতে পারি।

আমি বলছি না ভালোবাসতেই হবে, আমি চাই
কেউ একজন ভিতর থেকে আমার ঘরের দরোজা
খুলে দিক । কেউ আমাকে কিছু খেতে বলুক ।
কাম-বাসনার সঙ্গী না হোক, কেউ অন্তত আমাকে
জিজ্ঞেস করুক : 'তোমার চোখ এত লাল কেন ?'

আকাশসিরিজ

১
শুধু একবার তোমাকে ছোঁব,
ঐ আনন্দে কেটে যাবে সহস্র জীবন ।

শুধু একবার তোমাকে ছোঁব,
অহংকারে মুছে যাবে সকল দীনতা ।

শুধু একবার তোমাকে ছোঁব,
শুধু একবার পেতে চাই অমৃত আস্বাদ ।
শুধু একবার তোমাকে ছোঁব,
অমরত্ব বন্দী হবে হাতের মুঠোয় ।

শুধু একবার তোমাকে ছোঁব,
তারপর হবো ইতিহাস ।

অগ্নিসঙ্গম

আমি কীভাবে অগ্নির সঙ্গে সঙ্গম করেছিলাম, সেই গল্পটা বলি ।
একদিন ঝড়ের রাতে ঈশ্বর এসে উপস্থিত হলেন আমার ঘরে ।
আমি সারাদিনের পরিশ্রম শেষে, তক্তাপোষে আরাম করে শুয়ে,
নিজের মনে, নিজের সঙ্গেই খেলা করছিলাম । আমার গাত্র
এবং মন উভয়ই ছিল নিরাবরণ । তিনি আমার ঘরে প্রবেশ করলেন
একটি চমৎকার দৃষ্টিনন্দন আলোকবর্তিকার রূপ ধরে, এবং
গায়েবি ভাষায় বললেন : 'আমি আপনাকে শিশ্নমুক্ত করতে এসেছি,
দয়া করে আপনি দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করুন ।'

আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ, তাই যেভাবে শুয়েছিলাম,

সেরকম শুয়ে থেকেই বললাম : 'খুব ভালো কথা, কিন্তু
আমি কি জানতে পারি, কী আমার অপরাধ?'
ঈশ্বর বললেন : হ্যাঁ, পারেন। আপনি সংশ্লিষ্ট যন্ত্রটিকে সৃষ্টির চেয়ে
অনাসৃষ্টির কাজেই বেশী ব্যবহার করেছেন। আপনি সামাজিক
নিয়ম-কানুন এবং স্থান-কাল-পাত্রের ভেদ মান্য করেন নি।'

তাঁর কথা শুনে আমার খুবই রাগ হলো। এ কি ঈশ্বরের যোগ্য কথা?
নিয়ম-কানুন, স্থান-কাল-পাত্রভেদে, মানে? তিনিও যদি মানুষের
মতোই কথা বলবেন, তা হলে আর ঈশ্বর কেন? একটু রাগতস্বরেই
আমি বললাম : 'আপনি কি জানেন না, আমি অভেদপন্থী?'

ঈশ্বর বললেন : 'জানি। আমি ভুল করে আপনাকে অসময়ে
পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলাম। আপনি আদিমকালের মানুষ;
এ-যুগ আপনার নয়। আমি আপনার প্রতি সম্মানবশত আপনাকে
উঠিয়ে নিতে নিজে এসেছি এজন্যে যে, আপনি আমার প্রিয়-কবি,
অন্যথায় আমি আমার যমদূতকেও পাঠাতে পারতাম।'

আমি বললাম : 'বেশ, ভালো কথা। কিন্তু ভুলটা যেহেতু আমার নয়,
আপনার, তাই আমার একটা শেষ-শর্ত আপনাকে পূরণ করতে হবে,
তারপর আমি আপনার কথা রাখবো।'

'বলুন কী শর্ত!' — ঈশ্বর জানতে চাইলেন।
আমি আমার লালিত একটি গোপন স্বপ্নকে মনের অতল থেকে
মুক্তি দিয়ে, কামনাজড়িতকণ্ঠে বললাম :
'শুধু একটিবারের জন্য আমি আপনার সঙ্গে মিলিত হতে চাই।'
মনে হলো, আমার প্রস্তাব শুনে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে
আলোকবর্তিকাটি ঘূর্ণিহাওয়ায় দুলে উঠলো।

স্থির হলে পর, গায়েবি ভাষায় ঈশ্বর বললেন : 'আমি অন্তর্যামী,
আমি আপনার এ-আকাঙ্ক্ষার কথা অনেক পূর্ব থেকেই জানি,
কিন্তু তা কখনই পূরণ হবার নয়। আমি নারী, পুরুষ বা কোনো
সঙ্গমযোগ্য প্রাণী নই, —আমি হচ্ছি অগ্নি, সর্বপাপঘ্ন অগ্নি আমি,
আমি নিশ্ছিদ্র। আপনি আমার সঙ্গে মিলিত হবেন কী ভাবে?'

আমি বললাম : 'সে ভাবনা আমার, আমি আমার প্রবেশপথ
তৈরী করে নেব। আমি শুধু আপনার সম্মতিটুকু চাই।'

ঈশ্বর বললেন : 'সাবধান, আপনি আমার দিকে অগ্রসর হবেন না।
আর এক পা-ও এগোবেন না, ভস্ম হয়ে যাবেন।'

প্রজ্জ্বলন্ত আলোকবর্তিকার মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করে আমি বললাম :
'ইতিপূর্বে বহুবার, বহুভাবে আমি ভস্ম হয়েছি, ভস্মের ভয় দেখিয়ে
আপনি আমার সঙ্গে ছলনা করছেন কেন? — আমি চাই আপনিও
আমার আনন্দের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করুন।'

নায়াগ্রা প্রপাতের অফুরন্ত জলধারার মতো আমার স্খলিত বীর্যধারায়
যখন শীতল হলো আলোকবর্তিকার সেই অগ্নিজ্বলা দেহ,
তখন গায়েবি ভাষা রূপান্তরিত হলো মধুক্ষরা মানবী ভাষায়।
ঈশ্বর বলেন : 'আমাকে অমান্য করার অপরাধে, দেখবেন,
একদিন আপনার খুব শাস্তি হবে।'

আমি অপসৃয়মাণ সেই আলোকবর্তিকার দিকে তাকিয়ে বললাম :
'কুচযুগ শোভিত, হে অগ্নিময়ী দেবী, তবে তাই হোক।'

সামুদ্রিক প্রেম

আমার প্রেম ছিল সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের মতো
তুমি চেয়েছিলে কবিতাপ্রধান প্রেম।
তাই, বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে
লঘু হয়ে আসা নিম্নচাপ যেরকম
শান্তরূপে অতিক্রম করে উপকূল—
তেমনি, কোনো ধ্বংসযজ্ঞ ছাড়াই
আমার প্রেম অতিক্রম করেছে তোমাকে।
তা না হলে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের মতো চোখের পলকে
সে তছনছ করে দিতে পারতো
তোমার সাজানো সংসার, গাছপালা, ঘরবাড়ি।
সে পারতো তোমাকে চিত্রল হরিণীর মতো
গভীর - গভীরতর সমুদ্রে ভাসিয়ে নিতে —
যেখানে চিত্রল হরিণীর সাথে চূড়ান্ত সঙ্গমে মাতে
ডোরাকাটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

শুধু তোমার জন্যে, শুধু তোমার কথা ভেবে,
সমুদ্রের নাভি থেকে জাগ্রত আমার অশান্ত প্রেমকে

আমি শান্ত সন্তের মতো তোমার সন্ত্রস্ত উপকূল
অতিক্রম করতে বলেছি ।
তোমাকে সে প্রদক্ষিণ করেছে, হজযাত্রীরা যেরকম
শান্তনগ্নপায়ে প্রদক্ষিণ করে পবিত্র কাবা ঘর ।
তোমার জন্য প্রেমকে আমি পরিণত করেছি কবিতায় ।
তাতে লাভ হয়েছে পাঠকের এবং তোমার ।
কিন্তু তার জন্য আমাকে কী করতে হয়েছে, জানো ?
এপ্রিলের সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের মতো
তোমার উপকূলের দিকে ছুটে-যাওয়া
আমার বিশ ফুট উঁচু আবেগের ঢেউগুলোকে
পুনরায় মধ্যসমুদ্রের দিকে ফেরত পাঠাতে গিয়ে
আমি রত্নাকর দস্যুর গায়ে পরিয়েছি বাল্মীকির বেশ ।

তুমি তোমার দূরন্ত ছেলেটির গায়ের জামা
বদল করার সময় নিশ্চয়ই বুঝবে,
কাজটা কবিতা লেখার মতো সহজ ছিল না ।

আমার প্রেমযজ্ঞের অশ্ব

আমার প্রেমকে আমি প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম
একটি ক্রমাগ্রসরমান সরলরেখার মাধ্যমে ;
কিন্তু কোনো সরলরেখাকে ধারণ করার জন্য
প্রস্তুত ছিল না এই গতিচঞ্চল পৃথিবী ।
অথচ এর গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে গিয়ে
আমি কী দণ্ডই না দিয়েছি আমার অবোধ অশ্বটিকে ।
চর্বি-মাখা চাবুকের শপাং শপাং আঘাতে-আঘাতে
বৃথাই আমি ক্ষতবিক্ষত করেছি তার দেহ ।

ধ্বংসের আগে আমি পৌঁছুতে পারিনি কোথাও ।

আমি দেখতে পাচ্ছি আমার চারপাশে এখনও সেই
একই মরুভূমি — বালিঝড়ের ভয়ে আমি যাকে
দুর্ধর্ষ বেদুঈনের মতো অতিক্রম করতে চেয়েছিলাম ।
এখনও সেই একই মরুভূমি, মধ্য-গগনের রোদে

আমাকে গ্রাস করবে বলে চকচক করা চোখ নিয়ে
ক্ষুধার্ত চিতার মতো ধেয়ে আসছে আমার দিকে ।
বৃত্তাকৃতি পৃথিবীর বক্র-স্বভাবই আমাকে পুনরায়
ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে সেখানে, যেখান থেকে
শুরু হয়েছিল আমার দিগ্বিজয়ী অশ্ব-অভিযান ।

এখন আমি মরুভূমির মধ্যবিন্দুতে দাঁড়িয়ে রয়েছি ।
আমার অনুগত অবোধ অশ্বটি এখন মৃত ।
আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার চোখের সামনে,
লু-হাওয়ায় উড়ে-আসা বালির ভিতরে
চাপা পড়ে-পড়ে ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে তার দেহ ।

আমি আর কোনো নবযাত্রার আয়োজন করবো না ।
বাকি সময়টা আমি তোমার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকতে চাই ।

নুড়ি

সেই কবে এক সন্ধ্যাবেলায় সমুদ্রসৈকতে
কুড়িয়ে পেয়েছিলাম আমি ছোট্ট একটি নুড়ি ।

তখন আমার কত বয়স ? ত্রিশ-একত্রিশ হবে,
তোমার তখন খুব বড়জোর ঊনিশ কিংবা কুড়ি ।

অভিভূত চিত্ত আমার তাই নে' ছিল মেতে ।
হারিয়ে-যাওয়া সেই নুড়িটি এখনো চাই পেতে ।

নুড়ি কোথায় ? কোথায় নুড়ি, কোথায় আমার নুড়ি ?
নুড়ি এখন সাগরজলে করছে লুকোচুরি ।

একসাগরের নুড়ি আমি সাতসাগরে খুঁজি,
আবার তাকে সচল খুঁজে-পাওয়া কঠিন হবে বুঝি ।

আমি ক্ষ্যাপার মতো খুঁজে বেড়াই তাকে,
চোখ দু'টোকে সচল রাখি কাজের ফাঁকে ফাঁকে ।

হঠাৎ সেদিন ব্যথা উঠলো অন্ত্রনালীর কাছে
এক্স-রে করে দেখি ওটা গলব্লাডারে আছে ।

চিকিৎসকরা বললো কেটে বাইরে ফেলে দিতে,
কিন্তু আমার কেন জানি বাধলো ঝুঁকি নিতে।

ওরা ভাবলেন রাজি হই নি কাটাচেরার ভয়ে,
আমি ভাবলাম — 'থাক্ না ওটা নিভৃত সঞ্চয়ে ।'

ম্যানহাটানের প্রতি

'Hey man, are you an Indian Yogi ?'
'না ভাই, I'am a poet from Bangladesh.'

'Bang-la-desh ? Bang-la-desh ?
Oh, I remember, how do you do ?'

'I' m fine, just fine.'
মনে-মনে ভাবি, সত্যিই কি মনে পড়েছে তার ?
ম্যানহাটানের এই দৈত্যপুরীতে কোথায় বাংলাদেশ ?
গগণচুম্বী, হে ধাতব চাতক পাখি, তোমার স্ল্যাব কংক্রিট
হৃদয় দোলাতে গিয়ে আমি তোমাকে শোনাতে চাই
আমাদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ইতিহাস ।
তোমার কি মনে পড়ে ত্রিশ লক্ষ প্রাণের আহুতি ?
বলো, সেই যুদ্ধে তুমি আমার বিরুদ্ধে ছিলে কেন ?
চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের দিনে, তোমার খাদ্যবাহী জাহাজগুলিকে
তুমি ভূমধ্যসমুদ্র থেকে কেন ফিরিয়ে নিয়েছিলে ?

কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো বিদ্যুৎবরফে ঢাকা, হে প্রাসাদ প্রতিমা,
আমি দেখামাত্র ভালোবেসে ফেলেছি তোমাকে ।
আমি চাই পরিণয়ে পূর্ণ হোক প্রেম ।ইষ্ট রিভারের জলে
মুখ ধুয়ে কবির কাছে তুমি স্বীকার করো তোমার ভুল,
আমি তোমার সমস্ত ফুল, গোলাপ-শেফালি-বেলি,
আর বাংলার কাঁঠালিচাঁপার গন্ধে ভরে দেবো ।

যে দেশের বুক থেকে সমুদ্র শত্রুর মতো
ক্রুর হাতে কাড়ে লক্ষ প্রাণ—
তার প্রতি অবিচার করো না, ম্যানহাটান ।

ভারত আমাদের গন্তব্য নয়

পুত্রীর হাত ধরে অন্ধকারে পালাচ্ছেন পিতা ।
পিতা ও পুত্রীকে নিয়ে একটি গরুড় পাখি উড়ে যাচ্ছে,
পশুত্বের কাছে পরাভূত বিশ-শতকের অন্তিম প্রহরে
এভাবে পালাতে হবে তাকে, ছিল তার চিন্তার অতীত ।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?' 'কন্যাটি জানতে চায়।
পিতা নিরুত্তর, যেন তার কর্ণকুহরে কোনো শব্দই
প্রবেশ করে নি । মেয়েটি ভেবে পায় না, তার পিতা
কেন যে এমন লজ্জায় পাখির ডানায় ঢাকে মুখ ।
সে বোঝে না, কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে উড়ে-আসা
এই পৌরাণিক পাখিটি যখন মূর্খের উল্লাস থেকে
তাঁদের উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছে চির-স্বস্তির দেশে,
তখন তার পিতাকে এমন পরাজিত, বিধ্বস্ত, বিষণ্ণ
দেখাচ্ছে কেন ? তবে কি এখনও তাঁর বুকের ভিতরে
জন্মভূমির জন্য কিছু মায়া অবশিষ্ট রয়ে গেছে ?

'বাবা, এই দেখো আমরা ভারতে এসে গেছি ।
এই তো গোমুখ-গাঙ্গোত্রী, গঙ্গাতীরে প্রয়াগের মেলা,
এই তো কাঞ্চনজঙ্ঘা, শান্তিনিকেতন । পাখিটিকে কি
মাটিতে নামতে বলবে না ? আর কত উড়ে বেড়াবে
আকাশে-আকাশে, ভারত কি আমাদের গন্তব্য নয় !'

কন্যাকে বুকের মধ্যেপাঁজরে জড়িয়ে, মাথা নেড়ে
পিতা বললেন; 'না মা, ভারত আমাদের গন্তব্য নয় ।'
কন্যা : 'তাহলে আমাদের গন্তব্য কোথায় ?'
এক অস্পষ্ট নক্ষত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে
পিতা বললেন : 'ঐ খানে ।'

তের নদী আর সাত-আসমান পাড়ি দিয়ে আসার পরও,
মেয়েটি তখন ঐ দূর-নক্ষত্রের মধ্যে তার ফেলে-আসা
বাড়ির পাশের শীর্ণ স্রোতস্বিনীটিকেই দেখতে পেলো ।
সে দেখলো, তার পর্ণকুটিরের গা বেয়ে লতিয়ে উঠছে
লাউ গাছের লকলকে ডগা, আর নিকানো উঠানে
রৌদ্র দেয়া ধান খুঁটে খাচ্ছে লাল-পায়ে ঘুঙুর বাঁধা হাঁস ।

অনন্ত বরফবীথি

মৃত্যুর পর তোমরা আমাকে কংসের জলে ভাসিয়ে দিও ।
যদি শিমুলের তুলো হতাম, বাতাসে উড়িয়ে দিতে বলতাম,
কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, আমি বাতাসের চেয়ে হালকা নই ।
আমাকে তোমরা কাঠের আগুনে পুড়িয়ে ফেলো না,
কিংবা মাটি খুঁড়ে কবর দিও না আজিমপুর বা বনানীতে ।
বর্জ্যপদার্থের মতো আমি চাই না মাটিতে মিশে যেতে ।
মৃত্যুর পর তোমরা আমাকে কংসের জলে ভাসিয়ে দিও ।
যাতে জলপথে ভাসতে -ভাসতে, ভাসতে-ভাসতে
আমি পৌঁছতে পারি পৃথিবীর নব-নব দেশে ।

জাপান-সাগরের মালবাহী জাহাজের সাথে পাল্লা দিয়ে
আমি ঢেউয়ের চূড়ায় ভেসে বেড়াবো, প্রাণহীন রাজহাঁস।
সিডনি বন্দরে, যদি সেখানে হঠাৎ মৈত্রেয়ীর দেখা পাই ।
ভারত বনাম নিউজিল্যাণ্ডের একদিনের ক্রিকেট ম্যাচ
দেখতে আমি দু'দিনের জন্য থামবো ডুনেডিনে ।
একরাত্রির জন্য ইচ্ছে আছে সায়গন নদীতে যাবার ।
রেড রিভারে রঙিন মাছের সঙ্গে খেলা করবো এক দিন ।
একদিন লস এঞ্জেলেসে হঠাৎ চুম্বন হয়ে ভেসে উঠবো
প্রিয়দর্শিনী নাসিমার হাসিমাখা মুখের লজ্জায় ।
তারপর কোনো এক গভীর নিশীথে আমি ধরা পড়বো
ক্যালিফোর্নিয়ায়, সান-ডি-আগোর বৃদ্ধ জেলের জালে ।

বলিভিয়ার জঙ্গলে ক্ষিপ্র -চিতার হরিণ শিকার দেখবো
একদিন, একদিন পেরুর অরণ্যঘেরা নির্জন দ্বীপে যাবো,
একদিন অলিভিয়ার সোনালি দাঁতের হাসি দেখার জন্য
ভাসতে-ভাসতে চলে যাবো এল সালভাদর ।

আমার আফ্রিকান বন্ধুদের দেখতে দক্ষিণ আটলান্টিকের
জলে ভেসে ভেসে আমি কেপটাউন আর এডেন বন্দর ছুঁয়ে
কয়েকদিন জন্য যাবো ঘানা, জিম্বাবোয়ে আর জাম্বিয়ায় ।
তারপর নিউ ইয়র্ক বন্দরের পথে আমি একটু জিরিয়ে নেবো
নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের তুষার-শীতল সবুজ শ্যাওলার নিচে ।

বাল্টিমোর, মেরীল্যাণ্ড হয়ে পূরবীর হারানো স্মৃতির টানে
শুধু একরাত্রির জন্য আমি যাবো ফিলাডেলফিয়ায় ।

এন্টার্কটিকায় যখন পেঙ্গুইন পাখিদের সঙ্গে দেখা হবে,
আমি তাদের কাছে বলবো আমার যাত্রাপথের গল্প ।
তাদের আমি আবৃত্তি করে শোনাবো আমার কবিতাগুলো
তাদের আতিথ্যে মহানন্দে কাটিয়ে দেবো কয়েক বছর ।

হ্যাঁ, আমি ইউরোপেও যাবো, যাবো ভার্সাই বুদাপেস্ট ।
রাইন-দানিয়ুব-ভলগা-লেনার জলে ভাসতে-ভাসতে
আমি পৌঁছাবো দূর-প্রাচ্যে, খাবারভক্সে, সাইবেরিয়ায় ।
ভেঙে-যাওয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন আর আমার দোভাষিকা
সুন্দরী লেনা দোব্‌রাভ্‌স্কায়ার কথা ভাবতে-ভাবতে,
মেঘের মশারি টানিয়ে বৈকাল হ্রদের জলে দেবো দীর্ঘ ঘুম।
জাগবো না, যতক্ষণ না ইস্রাফিলের শিঙার ধ্বনিতে
গলতে শুরু করে অনন্ত বরফবীথি ; যতক্ষণ না
পদার্থের বিক্রিয়ায় স্থলভাগ স্থান বদল করে
জল-ভাগের সঙ্গে ।

কবির অগ্নিকাণ্ড

খুব ছোটোবেলায়, আমি খুব বড় একটি
অগ্নিকাণ্ড দেখেছিলাম । গোলাপপুর বাজারে,
ভগবান সাহার চারটি পাটের গুদাম চারদিন ধরে
সেই অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়েছিল ।

অন্যদের কাছে যাই হোক, ঐ চারটা দিন
আমার কাছে ছিল খুবই আনন্দের ।
কাছেই নদী থাকার পরও, গোপালপুরের মানুষ,
নদীকে উপহাস করা লেলিহান শিখা সমন্বিত
প্রবল অগ্নির কাছে পরাভূত হয়েছিল সেদিন ।

চতুর্থদিনের মাথায়, দাহ্যবস্তুর অভাবে
অগ্নি যখন নির্বাপিত প্রায়— তখন সেই অগ্নির দিকে

তাকিয়ে, আমার রক্তের ভিতরে পদ্মকুঁড়ির মতো
জাগ্রত হয়েছিল এক অনন্ত অগ্নির বাসনা ।
আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম,
বড় হলে তিনি যেন আমার ভিতরে
অগ্নি সৃজনের কৌশল দান করেন ।
ভগবান আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন ।
তাই, যৌবনে, আমার রক্তের ভিতরে
অজস্র ডালপালা মেলে পল্লবিত হয়েছিল
আমার প্রার্থিত অগ্নিশিখা ।

মানি, অন্যকে পুড়িয়ে নিজের রূপ ও শক্তিকে
যে প্রকাশ করে, সে নিষ্ঠুর ।
কিন্তু ঐ দিকটা আমার তখন চোখে পড়ে নি ।
আমি শুধু মুগ্ধ হয়ে দেখেছিলাম তার রূপের
সুবর্ণ-শিখার উল্লাসে ।

নির্বাপিত হবার পূর্ব-মুহূর্তে, দাহ্যবস্তুর কাছে
অগ্নি ক্ষমা চায় কিনা, আমি বলতে পারবো না ।
কিন্তু আমি আজ নতমস্তকে ক্ষমা চাইছি ।
ক্ষমা চাইছি এ জন্য যে, ঘৃণার অগ্নিতে আমি
যে-সব অশুভকে পোড়াতে চেয়েছিলাম,
তার একটিও আমি পোড়াতে পারি নি ; কিন্তু
কবির অহংকে পূর্ণ করতে গিয়ে, ভালোবাসা ও
যৌন-কামনার অগ্নিতে আমি বহু-রমণীর
পবিত্র হৃদয়কে দগ্ধ করেছি ।

হে অনন্ত আনন্দ উদ্যান

আমি কি জানি না, এই বৈরী-পৃথিবীতে
শুধু তুমি ছাড়া কতটা দুর্লভ ছিল সুখ ?
আমি কি জানি না, এই নিস্তরঙ্গ অকূল পাথারে
তুমি ছাড়া কতটা অসহ্য ছিল বাঁচা !

আমি খুব লক্ষ্য করে দেখেছি তোমাকে —
যতক্ষণ জাগ্রত থাকো তুমি,

ততক্ষণই আনন্দ আমার ।

ঠিক ততক্ষণই আনন্দ আমার ।

যখন জাগ্রত হও তুমি, আমি মৃত্যুকে মন্থন করে
জীবনের বিষপাত্রে খুঁজে পাই রতিশুভ্র ননীর সন্ধান

আমি খুব লক্ষ্য করে দেখেছি তোমাকে,
যখন ঘুমিয়ে পড়ো তুমি, তখন আমার দেহে
প্রাণের আনন্দ বলে কিছুই থাকে না ।
শুধু অকারণ, অর্থহীন জীবনের তুচ্ছতার গ্লানি
ছুটে এসে বেদনার বেশে জড়ায় আমাকে ।
তখন আমাকে আমি চিনতে পারি না ।

আমি খুব লক্ষ্য করে দেখেছি তোমাকে,
যখন জাগ্রত থাকো তুমি আমি সমকামিদের মতো
পুরুষকেও ভালোবেসে আদর করতে পারি ।
আমি খুব লক্ষ্য করে দেখেছি তোমাকে,
যখন জাগ্রত থাকো তুমি বাঘিনীর হা-করা মুখেও
আমি চুম্বন করতে ভয় করি না ।
যখন জাগ্রত থাকো তুমি, অবলার অগম্যবিবরে
কী ভালোবেসেই না প্রবেশ করে আমার জিহ্বা ।
তখন আমার ভিতরে ঘৃণা বলে কিছুই থাকে না ।
আমি প্রেমিকার পায়ুপথে নাক গুঁজে খুঁজে পাই
এক অপার্থিব অর্কিডের ঘ্রাণ ।

হে পয়মন্ত যৌবন আমার, হে অনন্ত আনন্দউদ্যান,
বলো, তুমি কক্‌খনো ছেড়ে যাবো না আমাকে !

আত্মজীবনী তৃতীয় খণ্ড

আমি দশদিগন্তে দশ নারীকে নিয়ে শুই ।
আমাকে তারা ঘিরে রাখে কাঠমাণ্ডুকে যেমন পাহাড়

আমার উত্তরে গৌরী, দক্ষিণে কল্পনা ;
পূর্বে পবিত্র গীতা, পশ্চিমে পাবক ।
আমার ঈষাণে উর্বশী দেবী, নৈঋতে নির্ঝর ।

বায়ুকোণে ভালোবাসা, অগ্নিকোণে ছায়া;
আর অধোকোণে মণিরত্না, ঊর্ধ্বকোণে মায়া ।

এদের আবার প্রত্যেকেরই একাধিক যোগিনী রয়েছে ।
আমাকে তারা আগলে রাখে যাবতীয় বদরশ্মি থেকে
যেমন ওজনছাতা পৃথিবী নামের এই ছোট্ট-গ্রহটিকে।

এর পরও আমার ভয় কাটে না, মনে হয় এই বুঝি
দুর্নিরীক্ষ্য ছিদ্রপথ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে যম ।

দুই সহোদরার মাঝখানে

কাল রাত এই নগরীতে খুব চমৎকার অন্ধকার ছিল ।
কাল রাত আমি দুই সহোদরার মাঝখানে শুয়েছিলাম ।
কয়েক মিনিটের ব্যবধানে এই জমকের জন্ম হয়েছে ।
এদের বড়টির নাম মৃত্যু, তার গায়ের রঙ ঘন কালো ;
ছোটটির নাম জীবন, বড়টির তুলনায় সামান্য ফর্শা ।
তবে, অন্ধকারে তাদের বর্ণভেদ প্রায় বোঝা যায় না ।

তৃপ্তি ও আনন্দের উপলব্ধিকে বাঙময় করা ছাড়া,
কাল রাত ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগে পর্যন্ত
আমি একবারের জন্যও বন্ধ করিনি আমার চোখ ।
কাল রাতে আমি একটুও ঘুমাইনি, আমি জেগেছিলাম,
মানে, যতটা জেগে থাকা মানুষের পক্ষে সম্ভব ।
কেন না আমি জানি, পঞ্চাশ সহস্র বর্ষ অপেক্ষার শেষে
আমি এই অবিশ্বাস্য রজনী পেয়েছি ।

আমি বহুদিন, বহুভাবে আমার বিরুদ্ধে নারীকে
এবং নারীর বিরুদ্ধে আমাকে লেলিয়ে দিয়ে দেখেছি ;
তারা পরস্পরকে নিয়ে কী পাগলামিটাই না করেছে !
আগে আমি এদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি পৃথকভাবে ।
জীবনের বুকে মুখ ঘষে জীবনকে বলেছি, ভালোবাসি ।
জীবনের দৃষ্টি এড়িয়ে, আমি একই কথা বলেছি মৃত্যুকে
জীবনের সামনে মৃত্যু এবং মৃত্যুর সামনে জীবনকে

প্রকাশ্যে ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করা, এবারই প্রথম ।
আমি বলেছি, আমি তোমাদের দু'জনকেই ভালোবাসি ।
সুখের জন্য তোমাদের দু'জনকেই আমার প্রয়োজন ।

কাল অন্ধকার ছিল । বেশ অন্ধকার । খুব অন্ধকার ।
সূর্য ডুবে যাবার কারণে যে-ধরণের অন্ধকার হয়—
সেরকম নয়, তার চেয়ে বেশী এক ধরণের অন্ধকার ।
কসকো সাবানের মতো ট্রান্সপারেন্ট অন্ধকার নয়,
মাসের ডালের মতো ঘন-গাঢ় অন্ধকার ।

সেই ঘন-গাঢ় অন্ধকারে আমি একবার জীবনের,
একবার মৃত্যুর ঠোঁটে গচ্ছিত রেখেছি আমার চুম্বন ।
উন্মত্ত অবস্থায় এক-পর্যায়ে এমনও হয়েছে,
আমি একইসঙ্গে চুম্বন করেছি জীবনের অধর
এবং মৃত্যুর ওষ্ঠকে । তা আদৌ সম্ভব কি না,
আমি এখন আর বলতে পারবো না । পুরো ব্যাপারটাই
ছিল একটা পরাবাস্তব, স্বপ্নদৃশ্যের মতো ।
কল্পনায় দেখা । স্বপ্ন সত্য ।

কাল রাত আমি জীবনকে বুঝিয়েছি, ভয় করো না,
মৃত্যু নিষ্ঠুর কামুক রমণী নয় ; একই মাতৃগর্ভজাত,
সে তোমার বোন, তোমার মতই সে-ও খুবই মানবিক ।
একই কথা আমি একটু অন্যভাবে মৃত্যুকে বলেছি ।
মৃত্যু কাল তার অনুজার ক্লান্তমুখের ঘাম মুছিয়ে দিয়েছে ।

অথচ আশ্চর্য ! ভোরের আলো ফুটে উঠবার পর,
পরস্পরের দিকে পিঠ ফিরে শোওয়া দুই সহোদরাকে দেখে
মনে হলো ওদের দু'জনেই আমার কাছে সমান অচেনা ।
অথচ এদের অন্তত একজনকে আমার চেনার কথা ছিল ।

শিয়রে বাংলাদেশ

আমার যখন পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছিল,
তুই তখনও ছিলি আমার স্বপনে ।
আমি পাঁজর খুলে বলেছিলাম তোকে,
আমার বুকে যা আছে তুই সব নে ।।

আমার যখন পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছিল,
তুই তখনও ছিলি জন্ম-আশায় ।
তোকেই তখন বড় করে দেখেছিলাম বলে
সঁপিনি মন নারীর ভালোবাসায় ।

আমার যখন পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছিল,
তুই পরের ঘরে বন্দি ছিল, মা গো ।
আমি ঘর সাজানোর স্বপ্ন নিয়ে আসা
সুবর্ণাকেও বলেছিলাম, —'না-গো।'

আমার যখন পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছিল
অস্ত্র তুলে নিয়েছিলাম হাতে।
যুদ্ধ করতে গিয়েছিলাম দূরপাহাড়ী বনে
যদিও সায় ছিল না হত্যাতে ।

আমার যখন পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছিল
টগবগে লাল রক্ত ছিল বক্ষে ।
তখন তোকে নরক থেকে মুক্ত করা ছাড়া
আর কী শ্রেয় ছিল আমার পক্ষে ?

আমার যখন পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছিল,
বিজয়-গর্ব ছিল না তোর স্বরে ।
আমি তোকে বিজয় দিয়ে বিজয়বতী করে
দিয়েছিলাম ষোলই ডিসেম্বরে।

এখন যখন পঁচিশ বছর পূর্ণ হলো তোর,
আমি তখন তোকে রেখে পঞ্চাশে দিই দৌড় ।
রজতে নয়, সুবর্ণতে এ-দৌড় হবে শেষ,
তখনও তুই থাকবি আমার শিয়রে বাংলাদেশ ।

আগষ্ট, শোকের মাস, কাঁদো

এসেছে কান্নার দিন, কাঁদো বাঙালি, কাঁদো ।
জানি, দীর্ঘদিন কান্নার অধিকারহীন ছিলে তুমি,
হে ভাগ্যহত বাংলার মানুষ, আমি জানি,
একুশ বছর তুমি কাঁদতে পারোনি । আজ কাঁদো ।

আজ প্রাণ ভরে কাঁদো, এসেছে কান্নার দিন,
দীর্ঘ দুই-শতকের জমানো শোকের ঋণ
আজ শোধ কর অনন্ত ক্রন্দনে ।

তোমার বক্ষমুক্ত ক্রন্দনের আবেগী উচ্ছ্বাসে
আজ ভেসে যাক, ডুবে যাক এই বঙ্গীয় ব-দ্বীপ ।
মানুষের একত্রিত কান্না কত সুন্দর হতে পারে,
মানুষ জানে না । এবার জানাও । সবাই জানুক ।
মাটি থেকে উঠে আসা ঝিঁঝিঁর কান্নার মতো
তোমাদের কল্লোলিত ক্রন্দনের ধ্বনি শুনুক পৃথিবী ।
কাঁদো, তুমি পৃথিবী কাঁপিয়ে কাঁদো আজ ।

কান্নার আনন্দবঞ্চিত, হে দুর্ভাগা দেশের মানুষ,
তুমি দুধ না-পাওয়া ক্ষুধার্ত শিশুর মতো কাঁদো,
তুমি ভাই-হারানো নিঃসঙ্গ বোনের মতো কাঁদো,
তুমি পিতা-হারানো আদুরে কন্যার মতো কাঁদো,
তুমি জলোচ্ছ্বাসে নিঃস্ব মানুষের মতো কাঁদো,
তুমি সদ্যপ্রসূত মৃত শুইয়ে দিয়ে ঘরে ফিরে আসা
বৃদ্ধ পিতার মতো উঠানে লুটিয়ে পড়ে কাঁদো ।
যখন কাঁদতে চেয়েছিলে তখন কাঁদতে না-পারার
অসহায় ক্ষোভে, বেদনায় তুমি অক্ষমক্রোধে কাঁদো ।

একুশ বছর পরে, আজ মেঘ ফুঁড়ে উঠেছে মুজিবসূর্য
বাংলার আকাশে ; উল্লাসে নয়, কান্নার মঙ্গলধ্বনিতে
আজ আবাহন করো তারে । কাঁদো, বাঙালি, কাঁদো ।
এসেছে কান্নার দিন মুজিববিহীন এই স্বাধীন বাংলায় ।

আজ উৎপাটিত বটপত্রের শুভ্র-কষের মতো
চোখ বেয়ে ঝরুক তোমার অশ্রুবিন্দুরাশি ।
আজ কাটা-খেজুর গাছের উষ্ণ রসের মতো
বুকের জমানো কান্না ঝরুক মাটির কলসে ।

একুশ বছর পর, আজ এসেছে আগস্ট ।
August is the cruelest month
আগস্ট শোকের মাস, পাপমগ্ন, নির্মম-নিষ্ঠুর,
তাকে পাপ থেকে মুক্ত করো কান্নায়, কান্নায় ।

কবিতাতাজমহল

তাঁর বাম করতল ফুঁড়ে বিদ্যুতবেগে
প্রবেশ করছে মৃত্যু । তখন গভীর রাত ।
তাই সকালের দিকে জানাজানি হলো ।
অবশেষে লোকটার এমন মরণ হবে,
তা কি কেউ ভাবতে পেরেছিলো ?
না । কেউ-ই ভাবতে পারেন নাই ।
বিদ্যুতের তার ছিল তার হাতে ধরা ।
জীবন কোথায় ? জীবনের পরিবর্তে
তাঁকে ঘিরে বসেছিল মৃত্যুর প্রহরা ।

সরকারবিরোধী ছিল বলে, মরদেহে
পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে
ছুটে আসেনি কোনো রাজকর্মচারী ।
শুধু প্রতিবেশী, ক'জন কবির ভক্ত,
একজন নিকট আত্মীয়,
ও চার-বয়সের
চার-রকমের চারজন দেশী নারী
তাঁর নীরবস্থির শব ঘিরে বসেছিল ।
আর দুঃখীমানুষের সাথে পাল্লা দিয়ে
পরিচিত ক'টি পাতিকাক কা-কা রবে
ভারী করছিল ভোরের আকাশ ।

কবির আত্মনাশের দুঃসংবাদ শুনে
পলাশীতে ছুটে এসেছিল যারা,
তাদের কারও মুখে আসূয়া মাখানো ;
কারও মুখে হারানো দিনের স্মৃতি—

কারও মুখ অপরাধবোধে নত ।
কেউবা কোবে নগরীর ভাগ্যহত
মানুষের মতো মুহূর্তের ভূমিকম্পে
গোপন-প্রণয় প্রকাশ্যে হারিয়ে নিঃস্ব ।

জীবন আড়াল করে রেখেছিল যারে,
সে কি জানিত না,
একদিন জড়-পদার্থের মতো
মৃত্যু এসে তারে
তার গৃহপ্রাঙ্গনে করিবে প্রকাশ ?

জানিত, দিব্যদৃষ্টিধারী কবি
মৃত্যুঅন্তে তাকে নিয়ে যা-যা হবে,
তার সব কিছুই সে নির্ভুল জানিত।
তাই তো সে পরিতৃপ্ত এমন মৃত্যুতে ।

সে জানিত, প্রিয় নারীস্পর্শে পুনরায়
সে ফিরে পাবে তার প্রাণবায়ু ;
আর এই ফাঁকে, মৃত্যুর কষ্টিপাথরে
সে যাচাই করে নেবে, তার প্রতি
কার প্রেম কতটা গভীর ....।

মৃত্যু-পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবে,
কবি তাঁদের জন্য রচনা করবেন
এক-একটি কবিতা-তাজমহল ।

বার্ধক্য বিষয়ক ভাবনা

বার্ধক্যজনিত ব্যাধিতে ভুগে ভুগে
মারা গেলেন অকটাভিও পাজ ।
(ইন্নালিল্লাহে .... রাজউন)

সংজ্ঞাহীন শওকত ওসমানকে
সিএনএইচ-এ গিয়ে দেখে এসেছেন
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ।
সবচেয়ে মুখর মানুষটি এখন নীরব ।

বার্ধক্যে আক্রান্ত সুফিয়া কামালকে
ডাক্তাররা পরামর্শ দিয়েছেন
পূর্ণ বিশ্রামের ।
কিছুদিন ধরে তিনিও শয্যাশায়ী।

দৃষ্টি হারানোর ভয়ে
তটস্থ শামসুর রাহমান
ঘড়ির কাঁটা মান্য করে
চোখে দিচ্ছেন আই ড্রপ ।
ঘন মেঘের মতো কফ জমছে
তার বুকের আকাশে ।

এনলার্জ প্রোস্টেট হেতু
মূত্রথলির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে
আজকাল ঘনঘন টয়লেটের
সন্ধান করছেন আমার বন্ধুরা ।
রক্তের শর্করার পরিমাণ নিয়েও
তারা এখন সমান ভাবিত ।

হৃৎপিণ্ডের রক্তসঞ্চালনের বিকল্প পথ
তৈরী করে নিয়েছেন
সৈয়দ শামসুল হক, সিকদার, জাহিদ ।
তাদের উত্তেজক সঙ্গম বর্জনের
পরামর্শ দিয়েছেন ডাক্তার ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে : ক্রমশ বুড়িয়ে আসা
স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন,
পৃথিবী নামক এই যৌনমৌন গ্রহটিকে
প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবে কে ?

আমি সময়কে জন্মাতে দেখেছি

ফাল্গুন-ঔরসে, চৈত্র-গর্ভে
জন্ম হয়েছে এই কবিতার ।

আমি এবারই জানলাম,
বছরের বারো মাসের মধ্যে
ছয়টি হচ্ছে পুরুষ মাস,
ছয়টি হচ্ছে নারী মাস ।
ঋতুর প্রথম মাসটি পুরুষ,
দ্বিতীয় মাসটি হচ্ছে নারী ।

অনন্ত সঙ্গমরত এই দুই
নারী ও পুরুষ ক্রমাগত
জন্ম দিয়ে চলেছে সময় ।
লক্ষ, কোটি, অযুত সময় .....।

বরফাবৃত পর্বতশিখরে,
মেঘলোকে, হ্রদজলে,
ধূলিস্তব্ধ মরুর ভিতরে
সূর্যোদয়ে অথবা সূর্যাস্তে
পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে,
আমি সময়কে দেখেছি ।

আমি সময়কে
জন্মাতে দেখেছি ।

আমি দেখেছি—
বৈশাখের গায়ের ওপর
গড়িয়ে পড়েছে দিন ।

আমি দেখেছি—
নারীর গায়ের ওপর
গড়িয়ে পড়েছে পুরুষ,
পুরুষে পড়েছে নারী ।

২
কা লাভ সমুখে তাকিয়ে ?
পশ্চাতেও সমুদ্র অপার ।
মানুষ তো কোন্ ছাড়,
জীবক্রুদ্ধ সময়ের ভার
হরিয়াছে অহল্যার
স্বর্গজয়ী স্তনের গৌরব ।
তবু প্রত্নতত্ত্ববিদের মতন
ভগ্নস্তনসৌধ খুঁড়ে-খুঁড়ে
আইনস্টাইন ফিরিতে চান
সময়ের প্রথম প্রহরে ।

৩৫

স্তনবৃন্তে গোপনে সজ্জিত ছিল
তনুর অণুর অস্ত্র——;
স্তনপ্রেমী আঁধার রজনী তাকে
ঢেকে রেখেছিল স্বচ্ছ বস্ত্রবৎ ।

বুকের বস্ত্র সরিয়ে বাৎস্যায়ন
দেখিলেন তার স্তনবৃন্তের রূপ ।
দেখিলেন সেই অপরূপ শোভা,
মনোলোভা, নিদ্রিতা, নিশ্চুপ।

ক্রমশ এক কুচযুগ পরিণত হবে
পয়োধরে, দুগ্ধবতী নারী হয়ে
সন্তানের চাহিদা মিটিয়ে শেষে
ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে সময়ের হাতে ।

তবে কি লুট করবার উদ্দেশ্যেই
এরকম যুগল কুসুম নারীদেহে
ফুটিয়েছে সময়-কামুক ঈশ্বর ?

বাৎস্যায়ন স্থির করলেন, তিনি
অনাবৃত স্তনযুগলকে সঙ্গোপনে
আচ্ছাদিত করে, ফিরে যাবেন ।

ঠিক ঐ মুহূর্তেই ঘটলো দুর্ঘটনা ।
অসতর্ক পুরুষ-আঙুলের
সামান্য আঘাতে বিভাজিত হল
পরমাণু, বিস্ফোরিত হল বোমা ।

কুচযুগে ঝাঁপ দিলে কবির সংযম,
ধ্বংসস্তূপ থেকে উত্থিত হলো যম

০৮

এক ডাকে অরণ্যের বাঘও যায় না ছুটে,
কিন্তু আমি যাই, আমি ছুটে যাই, আমি
কামভিখিরির মত কপর্দকশূন্য করপুটে
তোমার অগ্নির টানে ছুটে যাই, হাওয়া ।

রাজৈশ্বর্যের চেয়েও ঢের বেশি মূল্যবান
মণিরত্ন ছিল আমার সুবর্ণ-অর্ণবপোতে।
তোমাকে আবিষ্কার করব বলে, আমার
সমুদ্রজয়ী দেহকে আমি কলম্বাসের মত
ভাসিয়েছিলাম তোমার জলে, কল্পনায়
আমি দুলেছিলাম তোমার জল-স্রোতে ।

তুমিই আমার মধ্যে সৃষ্টি করেছ কবিতা,
তুমিই প্রশ্রয়দানে অগ্নিকে করেছ প্রবল,
আমার নশ্বর মনে তুমিই তৈরী করেছো
অমরত্বের তৃষ্ণা, — সৃষ্টি করেছো চাওয়া ।

তুমি আমার সবচেয়ে বড় সুখের স্মৃতি,
তুমি আমার সবচেয়ে বড় কষ্ট পাওয়া ।

১২

মানুষকে খুশি করার জন্য
ফুল হয়ে ফোটা ভালো,—
এরকম কিছু ভেবে আমি
এই অভয়ারণ্যে ফুটিনি ।
আমি পৃথিবীর দুখী ফুল,
মানুষের হৃদয়ে ফুটেছি ।

সুন্দরকে পান করব বলে
সূর্য ওঠার আগেই

আমি গ্রীষ্মের রোদ হয়ে
ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম
গৌরী-ঘাসের শিশিরে।

অনিবৃত্ত কামের অগ্নিতে
যখন ডালির জেব্রার মতো
ঝলসে গিয়েছে এই দেহ,
তখন গণিকার পদতলেই
আমি খুঁজে পেয়েছিলাম
আমার বেহেশত ।

আমি অনুসরণ করেছি,
আমার রক্তের গোত্রকেই ।
তাতে প্রাণিজগতের সঙ্গে
মিটেছে আমার বিরোধ ।

মানুষকে কখনোই আমার
শ্রেষ্ঠ প্রাণী মনে হয়নি ।
আমি মানুষের চেয়ে বেশি
ভালোবাসি হাঁসের সঙ্গম ।

২২

পায়ের তলায় নিদ্রিত ছিল মাটি,
অচেতন ভেবে করিনি অধ্যয়ন।
মাঝ রাতে আজ অন্ধতাহেতু
ভূকম্পনের শিখরে পড়েছে পা,
স্নায়ুকোষে তাই বিদ্যুত শিহরণ ।

পায়ের তলায় নরম ঠেকল কী ?
তুমি কি মাটিতে শুয়েছো ঠাকুরঝি ?

বহুদিন এ-মাটিতে ফুটেছে কাঁটা,
লতা গুল্ম, বড়জোর কাঁটাবন,
আজ মনে হলো মাটিতে ফুটেছে
অনাবৃতা নারীর ঘুমানো স্তন ।

পায়ের তলায় কোমল ঠেকল কী ?
তুমি কি উদাম শুয়েছো ঠাকুরঝি ?

এদ্দিন পলিমাটিতে ফুটেছে ধান,
কচি দূর্বা, কখনওবা মুথা ঘাস—;
আজ মনে হলো পায়ের তলায়
অনিদ্রিতার কামার্ত নিঃশ্বাস ।

পায়ের তলায় গরম ঠেকল কী ?
তুমি কি সত্যি ঘুমিয়ে ঠাকুরঝি ?

কোজাগরী রাতে, পালঙ্কহীন
এই ভূমি-শয্যায়, দৈবদুর্বিপাকে
রাতভর আমি মাটি ছেনে তাকে
প্রতিমার মতো করেছি নির্মাণ ।

নির্মাণ শেষে ছিটিয়ে দিয়েছি ঘি,
তুমি কি বধূকে চিনেছ ঠাকুরঝি ?

২৪

যখন আমি নগ্ন হই
তখনই আমি কবি ।